অনুরাগী

পাঠক-পাঠিকাকে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

রাত্রি শেষের তারা

অভিশপ্ত পুথি

মায়ামৃগ

নিশিবধূ

চম্পাবাঈ

রুক্মিণীবাঈ

ক্যামোলিয়া

ভেনডেটা

সূর্যমহল

কালোছায়া

এক

লক্ষ্ণৌ। সদর বাজার থানা।

শীতের রাত!...

রাত প্রায় এগারোটা হবে। লক্ষ্ণৌ সদর বাজারের থানায় আই. বি-র অফিসার সুন্দর সিং তার বন্ধু থানা ইনচার্জ দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন, এমন সময় ছুটতে ছুটতে একজন ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়সের যুবক একটি কনস্টেবলের সঙ্গে থানায় এসে ঢুকল।

আগন্তুক ভদ্রলোক একজন ডাক্তার। নাম রূপলাল ঝাঁ!

কী ব্যাপার? দেলোয়ার হোসেন প্রশ্ন করলেন, এত রাত্রে ছুটতে ছুটতে আসছেন?

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

সর্বনাশ!

হাঁ—বলতে বলতে ডাঃ রূপলাল ঝাঁ হাঁপাতে থাকেন।

বসুন, বসুন—বলুন কি হয়েছে শুনি।

সঙ্গের কনস্টেবলটিই বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে ডাঃ রূপলাল ঝাঁই বললেন, বোধ হয় মারা গেছে—

মারা গেছে! কে?

আমার বাড়িতে উপরের ঘরে কয়েক দিন হলো একজন ভাড়াটে এসেছেন। আজ কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ একটা গোলমাল ও শব্দ শুনে উপরে গিয়ে দেখি ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। ভদ্রলোকের সাড়া শব্দ নেই! আপনি একবার শীঘ্র চলুন।...

ডেকেছিলেন?

হাঁ—কোন সাড়া শব্দ নেই। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে!

আপনি একবার চলুন হোসেন সাহেব।

আমি একজন জমাদার পাঠিয়ে দিচ্ছি—

না, না—আপনি চলুন।

দেলোয়ার হোসেন তখন যেন কতকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, চলুন, মিঃ সিং যাবেন নাকি?...

কেন যাব না। চলুন।

সকলে রূপলাল ডাক্তারের বাড়ীতে এলেন। ডাক্তারের ছোট ভাই সুন্দরলাল দরজার উপরেই উদগ্রীব হয়ে ওঁদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

কোথায়। কোন্ ঘরে। দেলোয়ার হোসেন শুধান।

উপরের ঘরে।

চলুন—

সকলেই উপরে উঠতে থাকেন সিঁড়ি দিয়ে।

উপরে গিয়ে দেখা গেল, দরজা ভিতর থেকে সত্যিই বন্ধ।

তখন প্রথমে ভদ্রলোকের নাম ধরে বিস্তর ডাকাডাকি করা হলো কিন্তু কোন সাড়া শব্দই পাওয়া গেল না। দরজায় ধাক্কা দেওয়া হলো তবু কোন সাড়া শব্দ নেই।

দেলোয়ার পুলিশকে হুকুম দিলেন দরজা ভেঙে ফেলতে। ঠেলা ঠেলি করে দরজা ভেঙ্গে সকলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। পথে আসতে আসতেই ডাঃ রূপলাল ঝাঁ বলেছিলেন তার ভাড়াটের নাম গুরুদয়াল সিং। দেখা গেল গুরুদয়ালের দেহটা লম্বালম্বি ভাবে মেঝেতে পড়ে আছে। কপালের একপাশ কেটে গেছে। মেঝেতে একটা রক্তের ধারা!

একটা স্টীল ট্রাংক ঘরের কোণে পড়ে আছে সেটা খোলা, এলোমেলো। সামনেই টেবিলের উপরে একটা দুধের গ্লাস!

দেলোয়ার নীচু হয়ে লোকটাকে একবার পরীক্ষা করলেন তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন—নাঃ, মারা গেছে!

সুন্দর সিং ঘরের চারিপাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, হঠাৎ গরাদহীন জানালাটার সামনে এগিয়ে গেলেন। জানালাপথে বাইরে তাকালেই চোখে পড়ে সামনেই কার গ্যারেজের টিনের ছাদ। এবং জানালাপথে অনায়াসেই লাফিয়ে ঐ গ্যারেজের ছাদে পড়া যায়।

প্রশ্ন করলেন, ওই পাশের বাড়িতে কারা থাকে ডাক্তার ঝাঁ?

ওটা মাস দুই হোল খালিই পড়ে আছে, কেউ নেই। ডাক্তার ঝাঁ

বললেন।

দেলোয়ারও জানালাটা একবার দেখলেন, বাইরে একবার তাকালেন, তারপর ধীরভাবে প্রশ্ন করলেন, এই জানালাপথেই মনে হচ্ছে আততায়ী এসেছিল। আপনারা কোন রকম শব্দ শোনেননি?

শব্দ! হাঁ আমরা যখন দরজার বাইরে ডাকাডাকি করছি, শব্দ পেয়েছিলাম একটা কে যেন টিনের ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল মনে হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বাইরে গেলাম, দেখলাম কে একজন তীরবেগে ছুটে মাঠের উপর দিয়ে রেল লাইনের দিকে অন্ধকারে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। ধরতে পারলাম না।...তখন ছুটে থানায় গেছি।

ডাঃ রূপলাল ঝাঁর কথাগুলো যেন কেমন এলোমেলো। দেলোয়ার হোসেন তাকালেন ডাক্তারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

লোকটার পরিচয় কিছু জানতেন ডাক্তারবাবু? অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে যেন প্রশ্নটা করলেন দেলোয়ার হোসেন সাহেব।

ও যা নিজের পরিচয় দিয়েছিল সেটা মিথ্যা। অথচ কেন যেন ওকে দেখে বার বার মনে হয়েছে ওকে আমি চিনি। কোথায় যেন দেখেছি এবং এখন মনে পড়ছে—

ওকে চিনতে পারছেন?

হাঁ, লোকটাকে আমি চিনতে পেরেছি দারোগা সাহেব, ওর আসল নাম গুরুদয়াল নয়...

গুরুদয়াল সিং নয়!

না।

তবে কি ওর নাম?

ওর নাম রহমৎ খাঁ!

রহমৎ!

হাঁ, রহমৎ খাঁ। বছর তিনেক আগে লাহোরের নবাব আমীর খাঁর হীরা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিখ্যাত ধনী মিঃ মেটার টালীগঞ্জের আস্তাবল থেকে মধুর খুন হবার পর ও পালায়। এ পর্যন্ত ওর আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায়নি!

বলেন কি?...

হাঁ তাই।...কেননা আমি ওর ফটো দেখেছিলাম কাগজে।

সকলে আবার তখন নীচে নেমে এল। পুলিস সার্জেনকে ডাকতে পাঠান হলো, মৃতদেহ পরীক্ষার জন্য!

নীচের ঘরে সবাই বসে আছে। পুলিস সার্জেন তখনো এসে পৌঁছয়নি, হঠাৎ ঐ সময় একটা যেন কুকুরের ডাক শোনা গেল বাড়ির মধ্যে থেকে। বারান্দার ওদিকে একটা বাথরুম ছিল, মনে হলো বন্ধ দরজা। সেই বাথরুমের ভিতর থেকে যেন একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

কুকুরটা বন্ধ দরজার উপরে নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে আর কুই কুই করে শব্দ করছে।...

দেলোয়ার সাহেব কথা বললেন, আপনার কুকুর আছে নাকি ডাক্তারবাবু?

রূপলাল নয় জবাবটা দিলেন তাঁর ভাই সুন্দরলাল। বললে, হ্যাঁ ঐ বাথরুমের মধ্যে একটা কুকুর আছে তবে ওটা আমাদের নয়...কুকুরটা আমাদের ঐ ভাড়াটেরই। ভদ্রলোকের সকাল থেকে শরীরটা ভাল ছিল না।

শরীর ভাল ছিল না?

না, মানে সকাল থেকে হার্টের প্যালপিটেশন খুব—কুকুরটা ঘরের মধ্যে চিৎকার করছিল তাই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন কুকুরটাকে তার নীচে দিয়ে আসবার জন্য, আমি কুকুরটাকে এনে বাথরুমে বন্ধ করে রেখেছি।

সুন্দর সিং উপর থেকে নীচে নেমে আসবার সময় উপরের ঘরের টেবিলের উপরে রক্ষিত দুধের গ্লাসটা হাতে করে নিয়ে এসেছিলেন, এবং নীচে এনে সেটা সামনের টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখেছিলেন। গ্লাসটা নিয়ে নামবার সময় দেখেছিলাম গ্লাস থেকে দুধ চলকে সিঁড়ির উপর পড়তে।

হঠাৎ সুন্দর সিং চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুলে দিলেন।

দরজাটা খুলে দিতেই কুকুরটা ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে এল এবং লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে চলল...হঠাৎ কুকুরটা সিঁড়ির মাঝপথে থেমে গিয়ে যেন দেখলাম, সেই দুধ সিঁড়ি থেকে চেটে চেটে খেতে লাগল।

বোধ হয় মিনিট খানেকও হবে না হঠাৎ কুকুরটা একটা তীব্র আর্তনাদ করে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে গেল।

সুন্দর সিং সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটার কাছে এক লাফে গিয়ে হাজির হলেন।

আশ্চর্য! কুকুরটা তখন মরে গেছে।

তিনি তখন তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে উঠলেন, দেখলেন সিঁড়ির উপরে খানিকটা দুধ তখনও পড়ে আছে। বুঝতে তাঁর আর বিলম্ব হলো না—ঐ দুধ চেটে খেয়েই কুকুরটার মৃত্যু হয়েছে। তাহলে তাঁর সন্দেহই ঠিক। দুধে বিষ মেশানো ছিল।...গম্ভীর হয়ে তিনি নীচে নেমে এসে রূপলাল ডাক্তারের সামনে দাঁড়ালেন।

ডাক্তারবাবু, এখন আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা সব মিথ্যা।...আপনার এ বাড়িতে কোন চোর আসে নি। আপনিই বিষ দিয়ে লোকটাকে খুন করেছেন।

সুন্দরলাল ডাক্তারের ভাই তখন পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল। হঠাৎ সে গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ করে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই রাত্রেই ডাঃ রূপলাল ঝাঁকে দেলোয়ার সাহেব গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন থানায়। আদালতে বিচার শুরু হলো ডাঃ রূপলাল ঝাঁর।

এবং পুলিস প্রমাণ করলে রহমৎ খাঁর অর্থের লোভেই তাকে দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করে ব্যাপারটা আত্মহত্যা বলে নিজের অপরাধকে ঢাকবার চেষ্টা করেছিল ডাঃ ঝাঁ। কিন্তু কুকুরটার আকস্মিক মৃত্যু ও সুন্দরলালের মস্তিষ্কবিকৃতিই সব গোলমাল করে দিল।

ডাক্তারের ভাইয়ের সুস্থতা আর ফিরে এল না, একবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল এবং বার বার বলতে লাগল, দাদা, ঐ দাদাই গুরুদয়ালকে দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে খুন করেছে।...

অনেক দিন ধরে রূপলাল ঝাঁর বিচার হলো এবং বিচারে তার ফাঁসীর হুকুম হলো।

কাল তার ফাঁসী!...

'তারপর।...

দুই

কিন্তু তারও আগে এ কাহিনীর শুরু।

দীর্ঘ দশ বছর আগেকার ঘটনা।

লাহোরে আমীর খাঁ নামে এক বিখ্যাত নবাব ছিলেন ; তাঁদের বংশে ইতিহাস বিখ্যাত একখানি বহু মূল্যবান কমল হীরা ছিল। নবাব বংশের কোন এক পূর্বপুরুষ বাদশা সাজাহানের কাছ থেকে নাকি পুরস্কারস্বরূপ হীরাখানি পেয়েছিলেন।

হীরাখানি ছিল নবাব বংশের লক্ষ্মী।...বংশপরম্পরায় হীরাখানি হস্তান্তরিত হতে হতে অবশেষে নবাব বংশের আমীর খাঁর হাতে এসে পড়ে।

হীরাখানি থাকত নবাবের খাস কামরায় এক লৌহ সিন্দুকে এক সুবর্ণ কৌটোয়।

মধ্যে মধ্যে নবাব আমীর খাঁ সিন্দুক খুলে হীরাখানি দেখতেন।

হঠাৎ একদিন বিকালে সিন্দুক খুলে দেখেন হীরাখানি নেই। তখুনি পুলিসে সংবাদ দেওয়া হলো।

শুরু হলো খানাতল্লাসী...দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা রুস্তম আলী এলো কিন্তু হীরার কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না।...যেন মন্ত্রবলে হীরাখানি হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরে নবাব সাহেব অনুসন্ধান চালালেন কিন্তু পাওয়া গেল না আর সে হীরা।

সে হীরা আর উদ্ধার করা গেল না। এবং ক্রমে হীরার কথা সকলেই ভুলে গেল...একটি দুটি করে অনেকগুলি বছর চলে গেল। কিন্তু হীরার কথা দু'জন ভুলতে পারল না...এক নবাব আমীর খাঁ এবং দ্বিতীয় গোয়েন্দা রুস্তম আলী।

হীরার অনুসন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে রুস্তম আলী কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হলেন। দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্যান্বেষণের উদ্দেশে একদিন কোথায় যেন তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন কেউ আর তাঁর খোঁজ

পেলেন না।

গোয়েন্দা রুস্তম আলীর বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর।

দৈর্ঘ্যে প্রায় লোকটা সাড়ে ছয় ফুট।

লাল টকটকে গায়ের রং।

পেশল বলিষ্ঠ গঠন।

একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল৷ টানা টানা কটা দুটি চোখ। বুদ্ধির প্রাখর্যে ঝক্ ঝক্ করে যেন উদ্যত দুটি ধারালো ছুরির ফলা।

সেই রুস্তম আলীর আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

রুস্তম আলী যেন হারিয়ে গেলেন।

আবার ফিরে আসা যাক গল্প যেখানে শুরু করেছিলাম। অর্থাৎ আবার দশ বছর পিছিয়ে আসা যাক।

গল্পের শুরু হচ্ছে দীর্ঘ দশ বছর পরে আবার।

স্থান লক্ষ্ণৌ জেল।

সময় ঃ রাত্রি।

জেলার দিলীর খাঁ এই লক্ষ্ণৌ জেলে বদলী হয়ে এসেছেন প্রায় বছরখানেক হলো।

উঁচু লম্বা চেহারা। এবং দেখলে মনে হয় যেন বয়েসের আন্দাজে একটু বেশী বড়ো হয়ে গিয়েছেন। একটু যেন কেমন কুঁজো হয়ে হাঁটেন।

হাত-পায়ের শিরাগুলো গায়ের চামড়া ঠেলে যেন দড়ির মতই সজাগ হয়ে উঠেছে।

এককালে হয়ত গায়ের রং পরিষ্কারই ছিল, এখন সেটা যেন রৌদ্রতাপে পুড়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে।

মাথার সামনের দিকে একটু টাক।

মুখখানা রুক্ষ পিঙ্গল বর্ণ!

গালের দু'পাশের হাড় দুটো 'ব'-এর আকারে বিশ্রীভাবে সজাগ হয়ে উঠেছে।

অবিরত ধূমপানের ফলে ঠোঁট দুটি কালো হয়ে গেছে।

ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগে এবং দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে

নিকোটিনের যেন একটা পলি পড়েছে।

কোঁটরগত চক্ষু দুটির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন মনের মাঝখান দিয়ে দাগ কেটে দেয়।

গলাটা খনখনে...ভাঙা!

সর্বদাই হাতে একটা জ্বলন্ত সিগ্রেট।

এক মুহূর্ত যেন ধূমপানের বিরতি নেই। চেইন স্মোকার।

কথা বলেন খুবই কম।

হাসতে কেউ কোনদিন ওঁকে দেখেনি।

লোকটার দয়া মায়া বলে কোন মনোবৃত্তির বালাই নেই। কারও সঙ্গে কোন দিনই মেশে না।

জেলখানার মস্ত বড় কমপাউণ্ডটার একপাশে একতলা কোয়ার্টারটি তার। একটা কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড আছে শান্তারাম, সেই তার সব কিছু করে।

দু'টি ঘর।

একটি ঘরে ও শোয়, অন্যটিতে চার-পাঁচটি আলমারীতে ঠাসা সব ইংরাজী বই।

জেলের কাজ করে দিনে ও রাতে যে সময়টা পায় তার মধ্যে বেশীর ভাগ ওর পড়াশোনাতেই কাটে।

আত্মীয়স্বজন দুনিয়ায় ওর কেউ আছে কিনা কেউ জানে না। তবে মাঝে মাঝে দু'চার দিনের ছুটি নিয়ে কোথায় চলে যায় ; কেউ জানে না।

জেল।

মাঝখানে একটা সরু গলিপথ, তার দু'পাশে সব কয়েদীদের থাকবার ঘর, সেল।

গলি পথ গিয়ে শেষ হয়েছে প্রশস্ত আঙ্গিনায়, পাথরে বাঁধান আঙ্গিনা।

একটা স্বল্প পাওয়ারের ডোমে ঢাকা বৈদ্যুতিক বাতি গলি পথটাকে মৃদু আলোক দান করছে।

মৃতের চাউনির মতই সে আলো ফ্যাকাসে ও ঘোলাটে।

সতর্ক প্রহরীর বুট্ জুতোর লোহার নালের শব্দ কঠিন পাষাণ চত্বরে আওয়াজ তুলছে, খট্ খট্ খট্!...একঘেয়ে বিশ্রী!

গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে হাতে একটা টর্চ নিয়ে দিলীর খাঁ

রোঁদে বের হয়েছেন, প্রত্যেক সেলের সামনে একবার করে উঁকি দিয়ে যাচ্ছেন। রাত্রে কোয়ার্টারে শুতে যাবার আগে সমস্ত সেলগুলো ঘুরে দেখে যাওয়া জেলার দিলীর খাঁর একটা অভ্যাস।

এক নম্বর দু নম্বর করে একের পর এক সেলগুলো অতিক্রম করতে করতে এক সময় দিলীর খাঁ এসে ১৩নং সেলের সামনে দাঁড়াল।

তের নম্বর সেলের ১২৮ নং কয়েদী। তের নম্বর সেলটা একেবারে শেষ প্রান্তে—। জেলের মধ্যে ওটাই ফাঁসীর কয়েদীর সেল। ১২৮নং কয়েদী—ফাঁসীর আসামী।

ডাঃ রূপলাল ঝাঁ।

কাল প্রত্যুষে তার ফাঁসী!

ডাঃ রূপলাল ঝাঁ।

আর কয় ঘণ্টাই বা সময়। রাত্রি এখন সাড়ে নয়টা। শেষ রাত্রি সাড়ে পাঁচটায় ফাঁসি।

তের নম্বর কামরাটার কাছাকাছি আসার আগেই দিলীর খাঁর কানে ভেসে এসেছিল একটা গানের সুর।

চুকিয়ে দিলাম বেচা কেনা,
এ জীবনের যা কিছু মোর ছিল,
পাপ পুণ্যের হিসাব নিকাশ
এ জীবনের যা কিছু মোর ছিল।

দিলীর খাঁ থম্‌কে দাঁড়ালেন। রূপলালের গলা, ডাঃ রূপলালই গাইছে।

ফাঁসীর হুকুম অবধি সে এমনি করেই প্রায় সব সময় গান গায়।

প্রত্যহ এখান দিয়ে ঘুরবার সময় দিলীর খাঁ ওর গান শোনেন।

কাল তার ফাঁসী। কাল আর সে গান গাইবে না!...

ভৃত্য একজন কনেস্টবল এসে সামনে দাঁড়াল।

কি খবর ধ্যানচাঁদ?

ডিটেকটিভ্ সুন্দর সিং এসেছেন।

যাও তাকে আমার ঘরে বসাও, আমি আসছি।

সুন্দর সিং-ই রূপলালকে ধরেছিলেন।

তিন

দিলীর খাঁ এসে তাঁর বসবার ঘরে প্রবেশ কবল।

টেবিল ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলোয় ঘরখানি যেন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে।

একটা কৌচের উপরে হেলান দিয়ে বসে আছে ডিটেকটিভ সুন্দর সিং।

উঁচু লম্বা চেহারা।

দোহারা গঠন।

মুখের রেখায় রেখায় যেন একটা কঠিন সংকল্পের অভিব্যক্তি।

বয়স ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে হবে।

নিখুঁতভাবে দাড়ি গোঁফ কামান।

মাথার চুল সযত্নে ব্যাক ব্রাস করা।

পরিধানে দামী মভ্ কলারের ট্রপিকেল সুট!

দিলীর খাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখে সুন্দর সিং উঠে দাঁড়াল, এই যে খাঁ সাহেব, রোঁদ শেষ হলো!

দিলীর খাঁ সামনে একটা চেয়ারে বসতে বললে, হ্যাঁ—বসুন।...

পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেটটা বের করে তার থেকে একটা সিগ্রেট টেনে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে করতে মনে হলো যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

সুন্দর সিং কথা বললেন, তারপর খাঁ সাহেব, হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

মনে পড়ে আপনার একবছর আগে এমনি এক রাত্রে আপনি ডাঃ রূপলাল ঝাঁকে ধরেছিলেন?

হাঁ।

জানেন না বোধহয় কালই ডাঃ ঝাঁর ফাঁসী।

তাই নাকি!

হাঁ!

আচ্ছা আপনি রূপলাল সত্যিকারের জানেন মিঃ সিং?

ইতিহাস!

হাঁ—

কি বলুন তো।

জানেন না বুঝতে পারছি। শুনবেন সে ইতিহাস!

আমার কিন্তু বিশেষ একটা কাজ আছে, বেশীক্ষণ বসতে পারব না। একজন বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ!...

বেশী দেরি হবে না বসুন, বলতে বলতে দিয়েশলাই জ্বালিয়ে দিলীর খাঁ নতুন আর একটা সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করতে লাগলেন।

বেশ তবে বলুন।

সুন্দর সিং চেয়ারটার উপরে আর একটু আরাম করে যেন নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বসলেন।

দিলীর খাঁ বলতে লাগলেন, আজ থেকে দশ বছর আগে।

লাহোরের বিখ্যাত নবাব আমীর খাঁর সিন্দুক থেকে তাদের বংশের বাদ্‌শা সাজাহান প্রদত্ত ইতিহাস-বিখ্যাত কমল হীবাখানি চুরি যায়।

ও সব কাহিনী আমার জানা। সুন্দর সিং বলে।

জানেন, কিন্তু details জানেন না। শুনুন—দিলীর খাঁ আবার শুরু করলেন।

আমীর খাঁ যখন দেখলেন তাঁর সিন্দুকে হীরাখানি নেই, তখুনি তিনি বাড়ি ঘর তোলপাড় করে তুললেন। পুলিসেও সংবাদ দিলেন। পুলিসের জেরায় জেরায় বাড়ির একজন ভৃত্যর কাছে জানা গেল, ঐ বাড়িরই আর একজন ভৃত্য আবদুলকে নাকি নবাবের ঘরের দিকে যেদিন হীরাখানি চুরি হয়েছে আবিষ্কৃত হয়, সেদিন সকালে যেতে দেখা গিয়েছিল।

তারপর?

তখনি আবদুলের ডাক পড়ল। কিন্তু বাড়ির কোথায়ও আবদুলকে খুঁজে পাওয়া গেল না। খোঁজ করে জানা গেল আনারকলিতে আবদুলের

এক ভাই থাকত। সাহজাদা। আবদুল মাঝে মাঝে সেখানে ভাইয়ের সঙ্গে নাকি দেখা করতে যেত। পুলিসের লোক তখুনি আনারকলিতে সাহজাদার বাড়িতে ছুটলো। ছোট্ট একতলা একটা বাড়ির একটা ঘর নিয়ে সাহজাদা থাকত।

বলুন তারপর?

পুলিস গিয়ে দেখলে দরজায় তালা বন্ধ. পুলিসে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকলো, কিন্তু ঘরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়াল। মেঝের উপরে আবদুলের মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার গলায় কে যেন নৃশংসভাবে ছুরি চালিয়ে তাকে খুন করে রেখে গেছে! অনেক চেষ্টা করেও পুলিস নিরুদ্দিষ্ট সাহজাদা, আবদুলের মৃত্যু ও হারানো হীরাটার কোন কিনারা করতে পারলে না। ভারতের সমগ্র শহরে শহরে প্রত্যেক জুয়েলারীর দোকানে দোকানে পুলিসের লোক হীরাটার সন্ধানে ফিরতে লাগল। নবাবের দিক থেকে ত্রিশ হাজার টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করা হলো, কিন্তু খুনী, সাহজাদা বা হীরার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

তারপর?

শিকারী কুকুরের মতই পুলিসের গুপ্তচরেরা, গোয়েন্দারা ভারতের শহরে শহরে, নগরে নগরে, দোকানে দোকানে হীরাটার খোঁজে ফিরতে লাগল। এবং সেই পাঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে বিখ্যাত গোয়েন্দা রুস্তম আলি এই কাজের জন্য নিযুক্ত হলেন।

জানি। বলুন—

দীর্ঘ চারমাস রুস্তম আলি হারানো হীরাটার সন্ধানে দেশদেশান্তরে ঘুরে ঘুরে অবশেষে কঠিন রোগে পড়লেন।

শুনেছিলাম।

কতদিন শয্যায় পড়ে রইলেন ; ডাক্তার বললেন, Nervous breakdown হয়েছে রুস্তম আলির।

দিলীর খাঁ একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, তারপর একদিন হাওয়া বদলাতে কোথায় যে রুস্তম আলি চলে গেলেন, কেউ আর তারপরে তাঁর সন্ধান জানল না।

আবার কিছুক্ষণ থামলেন দিলীর খাঁ। আবার একটা নতুন সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করে বলতে লাগলেন —

এদিকে আর একজন লোক, যিনি প্রথম থেকেই সরকারের পক্ষ হয়ে হীরাটার অনুসন্ধান করছিলেন, তিনি কিন্তু তখনও আশা ছাড়তে পারেননি। একজন বণিকের ছদ্মবেশে ভদ্রলোক দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমনি ভাবে যখন তিনি লক্ষ্ণৌতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন হঠাৎ তাঁর জাহাঙ্গীর নামে একজন লোকের সঙ্গে এক হোটেলে আলাপ হয়। তার মুখে তিনি শুনতে পেলেন প্রীতম্ সিং নামে এক বিখ্যাত গুণ্ডার কাছে নাকি নবাব আমীর খাঁর কমল হীরাটা আছে। প্রীতম্ সিং হীরাটা বেচবার চেষ্টায় কলকাতায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাহাঙ্গীর স্বচক্ষে একদিন প্রীতম্ সিংয়ের কাছে হীরাটা দেখেছিলেন। ছদ্মবেশী গোয়েন্দা আর মুহূর্ত দেরি করলেন না, লক্ষ্ণৌ থেকে সেইদিনই সন্ধ্যায় কলকাতাগামী ক্যালকাটা মেইল ধরলেন। ভারতের বড় বড় শহরের পুলিসের খাতায় প্রীতম সিংয়ের নাম অনেকদিনই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক যেদিন সন্ধ্যায় ভদ্রলোক কলকাতায় পৌঁছলেন, তার আগের দিন কলকাতায় বিখ্যাত অ্যাভিনু হোটেলের এক কামরায় প্রীতম সিংয়ের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়, এবং খুনের ব্যাপার অনুসন্ধান করতে করতে পুলিস জহর নামে একজন দাগী আসামীকে প্রীতম সিংয়ের খুনের কয়েকদিন পরে রাস্তার ধারে মৃত অবস্থায় পায়।

সহসা এমন সময় সুন্দর সিং বললেন, হাঁ মনে আছে, কয়েক বছর আগে ব্যাপারটা সংবাদপত্রে পড়েছিলাম বটে এবং প্রীতম সিংয়ের খুনের কথাও অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়েছিল, খুনি দস্যু জহর সে সময় একই হোটেলে প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে উপরের তলায় একটা ঘরে ছিল।

দিলীর খাঁ সিগ্রেটে একটা মৃদু টান দিয়ে বলতে লাগলেন—হাঁ! কিন্তু আসলে ঘটনাটা কী হয়েছিল, তা এখনো কেউ জানে না। সেই ঘটনাতেই আমি আসছি। সেদিন রাত্রি তখন প্রায় এগারটা হবে জহর অ্যাভিনু হোটেলের চারতলার আঠার নম্বর ঘরের মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, নিজের কোমরে রক্ষিত চোরা চাবির গোছার একটা চাবির সাহায্যে ঘরটা খুলে, সেই ঘরে গিয়ে ঢোকে। অর্থাৎ হোটেলের যে ঘরে থাকত

প্রীতম সিং সেই ঘরে। নিজে একজন দাগী লোক হয়ে প্রীতম সিংকে যে সে একেবারে চিনত না তা নয়। এবং কানাঘুষাও শুনেছিল প্রীতম সিংয়ের কাছে ঐ সময় আমীর খাঁর হীরাটা আছে। এখবরও পেয়েছিল জহর প্রীতম সিং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বের হয়ে যেত আর ফিরত প্রায় শেষ রাত্রে। সারাটা দিন সে ঘরের মধ্যে খিল এঁটে পড়ে পড়ে ঘুমাত। সতর্ক শিকারী বিড়ালের মত জহর কিছুদিন ধরে প্রীতম সিংয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করলে। অবশেষে একদিন সুযোগ বুঝে প্রীতম সিংয়ের অনুপস্থিতিতে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরখানি মাঝারি আকারের।

আসবাবপত্র সামান্যই।

একখানি নেওয়ারের খাট। একটি বড় আলমারী ও একটি ড্রেসিং টেবিল। ঘরের সংলগ্ন ছোট বাথরুম।

ঘরের এক কোণে একটা মাঝারী আকারের টেবিল ও একটা চেয়ার। টেবিলের তলায় একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক ও তার পরে একটা চামড়ার অ্যাটাচী কেস্। জহর জানত এমন সময় প্রীতম সিং কোন দিনই ফেরে না, তাই ও নির্ভয়ে দরজার ল্যাচকীটা এঁটে পায়ে পায়ে স্টীল ট্রাঙ্কটার দিকে এগিয়ে গেল।

সবে সে স্টীল ট্রাঙ্কটার উপর থেকে অ্যাটাচী কেসটা নামিয়েছে, সহসা এমন সময় ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ও চকিতে একটা অস্ফুট শব্দ করে লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে চাইতেই ভয়ে কাঠ হয়ে 'থ' মেরে দাঁড়িয়ে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে প্রীতম সিং!

একটা ভয়ংকর ক্ষুধিত জিঘাংসায় চোখেব মণি দুটো যেন তার সাপের চোখের মত হিল্ হিল্ করছে।

কয়েক মুহূর্ত দুজনে দু'জনার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কারওই চোখের পলক পড়ে না।

দু'জনেই বুঝতে পারছে একটা ভয়ংকর মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে।

দুর্জয় সাহস জহরের। সেই প্রথমে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে খোলা

দরজাটা বন্ধ করে দরজার উপরে পিঠ রেখে হেলে দাঁড়াল।

এতক্ষণে প্রীতম সিং কথা বললে, কে তুই? এঘরে ঢুকেছিস্ কেন?

জহর নেকড়ের মত একটা ক্ষুধিত হাসি হেসে বললে, তা দিয়ে তোমার দরকার নেই সাঙাৎ! আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি আমায় চেন না। তবে নামটা শুনলে আশা করি চিনতে পারবে। লোকে আমায় জানে খুনী জহর বলে।

প্রীতম সিং যেন ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেছে, এমনি ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, তাই নাকি!

হাঁ—

তা খুনী জহরের আমার কাছে প্রয়োজনটা কি জানতে পারি কী?

নিশ্চয়ই—যা তোমার কাছে আছে তার ভাগ চাই।

কিসের ভাগ?

জহর তখন বলে, দেখ সিং মিথ্যে ভান করে কোন লাভ নেই। আর তাতে করে কারো কোন সুবিধাও হবে না। এখন ভালয় ভালয় লুঠের ভাগ দেবে কিনা বল। বলতে বলতে জহর তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা শাদা হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা তীক্ষ্ণ ধারাল ছুরি বের করলে।

ছুরির ধারালো ফলাটা যেন উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় মৃত্যুক্ষুধায় ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো।

প্রীতম সিং একটুও ভীত না হয়ে ধীর শান্তভাবে বললে, হাঁ প্রীতম সিংই আমার নাম বটে!...কিন্তু কি লুঠের ভাগের কথা তুই বলছিস বুঝতে পারছি না তো।

আর ন্যাকামি করতে হবে না সাঙাৎ!...জহর খুনী, এককথার মানুষ। এখন এসো তো চাঁদ চট্‌পট্ ভাগটা বের কর তো দেখি। আমি জানি লাহোরের নবাব আমীর খাঁর হীরাটা তোমারই কাছে! আমি সেটারই ভাগ চাই।

প্রীতম সিং অত্যন্ত শান্ত গলায় বললে, হীরার ভাগ চাই, না?

হাঁ—

সহসা কথাটা শেষ করার আগেই প্রীতম সিং ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতই জহরের উপরে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তখন সেই ঘরের মধ্যে দুজনায় মল্ল যুদ্ধ শুরু হলো।

কেউ শক্তিতে নেহাৎ কম যায় না।

জড়াজড়ি করতে করতে আচমকা মুহূর্তের সুযোগে জহর তার হাতের তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরিখানা সমূলে প্রীতম সিংয়ের বুকে বসিয়ে দিল।

একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে হতভাগ্য প্রীতম সিং মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ল। ঝলকে ঝলকে লাল রক্ত ওর বুকের ক্ষতস্থান দিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে লালে লাল হয়ে গেল।

চার
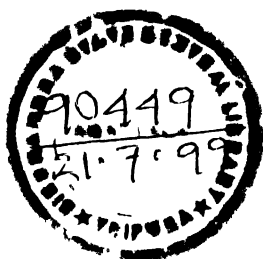
দিলীর খাঁ আবার বলতে লাগলেন, হতভাগ্য প্রীতম সিংয়ের শেষ নিঃশ্বাস রাতের বাতাসে মিলিয়ে গেল। জহর যখন বুঝতে পারলে প্রীতম সিং আর বেঁচে নেই, তখন সে হীরাটা খুঁজতে শুরু করলে। প্রথমে প্রীতম সিংয়ের পরিধানের জামা কাপড় সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলে, কিন্তু হীরাটা পেলে না। তারপর তার বাক্স, এ্যাটাচী কেস সব খুঁজলে, বিছানা উলটে পালটে দেখলে, নাঃ কোথাও হীরাটা নেই। তখন সে ঘরের দেওয়ালে টোকা দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল কোথাও কোন ফাঁপা জায়গা পাওয়া যায় কিনা? তাও পেল না। জহরের সর্বাঙ্গে বেয়ে পরিশ্রমে ঘাম ঝরছে!

হতাশ হয়ে সে চেয়ারটার উপরে বসল।

এমন সময় দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল।

জহর চকিতে উঠে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কান খাড়া করে দাঁড়াল।

আবার দরজায় শব্দ!...

কে? সিংজি আমি হোটেলের বয় রামু—আপনার সেই বন্ধু দু'টি এসেছেন ; উপরের ঘরে পাঠিয়ে দেব কী?...আজ সকালে আপনার কাছে যাদের আসবার কথা আছে বলেছিলেন।

জহর মুহূর্তে যেন কি ভেবে নিলে তারপর ভারী গলায় জবাব দিল, পাঠিয়ে দাও।

রামু চলে গেল।

জহর আবার সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বালাল।

কী এখন সে করবে? এই ফাঁকে সে কি পালিয়ে আত্মগোপন করবে?

কিন্তু যারা আসছে, তারা কে? হীরার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কি তাদের? হয়ত আছে হয়ত নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে জহর এঘর ছেড়ে যেতে পারে না। প্রীতম সিংয়ের কাছে যে হীরাটা আছে সে পাকা খবর সে পেয়েছে।

যদি লোক দুটো প্রীতম সিংয়ের চেনা হয়? কিন্তু সবার আগে প্রীতম সিংয়ের মৃতদেহটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। মেঝেতে রক্ত!...ও চট্ করে মৃতদেহটা টেনে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বিছানার তলা থেকে সতরঞ্চীটা টেনে মেঝেতে বিছিয়ে দিল। তাহলেও মুহূর্তেই জহরকে চিনে ফেলবে। এবং আগন্তুকরা যদি প্রীতম সিংয়ের দলের লোক হয় তবে জহরকে ছেড়ে কথা বলবে না নিশ্চয়ই।

জহর একবার হাতঘড়িটার দিকে তাকাল, রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটা। এত রাত্রে হোটেলের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউই প্রায় জেগে নেই।

শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কী হয়! এমনও তো হতে পারে যারা আসছে তারা ইতিপূর্বে প্রীতম সিংকে মোটে দেখেইনি? চেনেই না?

এমন সময় দালানে জুতোর শব্দ শোনা গেল।...মচমচ করে শব্দ ক্রমে এগিয়ে আসছে।

জহর চট্ করে উঠে আলোটা নিভিয়ে দিল, এবং মাথার টুপিটা দিয়ে এক দিককার কান ও চোখ ঢেকে ফেললে।

ডান হাত দিয়ে ছোরার বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরল।

রামুর গলা শোনা গেল। এই ঘর!...

পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত দীর্ঘকায় দু'জন লোক অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে থম্‌কে দাঁড়াল। একজন বললে, এ কোন্ ঘর...

অন্যজন জবাব দিল, চাকরটা তো বললে এইটাই প্রীতম সিংয়ের ঘর!

অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জহর আগন্তুকদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

এতক্ষণে সে কথা বললে, কে?

আগন্তুকদ্বয় অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কণ্ঠস্বর শুনে চম্‌কে গেল, একজন বললে, তুমি কে?

আমি প্রীতম সিং।...তোমরা কে?

একজন জবাব দিল, কালু সর্দারের কাছ থেকে আসছি।...তা আলোটা জ্বালুন না। একটু পরস্পরের চেনাশোনা হোক!...

জহর একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়ল, তবে এরা প্রীতম সিংকে চোখে

কোন দিন দেখেনি ইতিপূর্বে। সে এগিয়ে এসে সুইচটা টিপে আলোটা জ্বালাল।

বললে, তারপর কী সংবাদ?

কথা কটি বলে জহর তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে লোক দুটোর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একজন বললে, আমরা সন্ধ্যার সময় ও রাত্রি দশটায় দু দু'বার এসে ফিরে গেছি, আপনি তখন হোটেলে ছিলেন না।

হুঁ। একটা কাজে বাইরে ছিলাম।

কর্তা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। চলুন ট্যাক্সি নীচে অপেক্ষা করছে।

জহর ভাবতে লাগল। কালু সর্দারের নাম ইতিপূর্বে ও শোনেনি। এক্ষেত্রে এদের সঙ্গে সেখানে যাওয়া উচিত হবে কি?...ভাল করে না জেনেশুনে!

জহর চিন্তিত হয়ে পড়ে। কি করবে না করবে যেন একটা দোটানায় পড়ে।

ওদের মধ্যে একজন তখন বলছে, মালটার ব্যবস্থা আজই তিনি করে ফেলতে চান!

হঠাৎ যেন জহর সজাগ হয়ে ওঠে।

মালটা! মাল—অর্থাৎ হীরা। তাহলে হীরাটার ব্যাপারেই ফয়সলার জন্য ওরা প্রীতম সিংকে ডাকতে এসেছে। জহরের বুঝতে বিলম্ব হয় না আর যে হীরাটা প্রীতম সিংয়ের কাছেই ছিল।

তার অনুমান মিথ্যা নয়, এখনো তাহলে হীরাটা নিশ্চয়ই এঘরের মধ্যেই কোথায়ও আছে।

জহর হয়ত খুঁজে পায়নি, আরো ভাল করে সর্বত্র খোঁজা দরকার, জহর সঙ্গে সঙ্গে মনোস্থির করে ফেলে।

এদিকে লোকদুটো তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে একজন বলে—কী ভাবছেন স্যার! আর দেরী করছেন কেন?

দেখ সর্দারকে আমি বলেছিলাম বটে যে আজ আমি যাবো কিন্তু হঠাৎ একটু আটকে পড়েছি আজ রাত্রে—আজ আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে

না। সর্দারকে বলো, কাল সন্ধ্যেয় যাবো।

না, না তা কি হয়! সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তাছাড়া আমাদের উপরে হুকুম আছে, যেমন করে হোক আজই রাত্রে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে জহর বুঝতে পারে লোকদুটোকে নড়ানো যাবে না।

তাছাড়া জহর দেখল বেশী আপত্তি জানালে, ওরা হয়ত সন্দেহও করবে।

বললে, বেশ চল।

নীচে রাস্তার ওদিকে অন্ধকারে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, সকলে এসে গাড়িতে উঠল।

গাড়িও চলতে শুরু করল।

নিস্তব্ধ রাত্রি!

একে রাত্রির অন্ধকার, তার উপরে আবাব সমস্ত আকাশটা মেঘে মেঘে যেন ছেয়ে গেছে।

টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে।

পৌষের শেষ। বৃষ্টিকণাবাহী হিমশীতল শীতরাত্রির হাওয়া যেন হাডের মধ্যে কাঁপুনি জাগায়।

হঠাৎ একসময় একজন বললে, একটা কথা, কর্তার হুকুম আছে, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া। আশা করি এতে আপনার কোন আপত্তি নেই সিংজী।

কেন আমাকে বিশ্বাস হয় না নাকি?

লোকটি হেসে ফেললে, কী যে বলেন স্যার! আমরাও যদি পরস্পর পবস্পরকে না বিশ্বাস করতে পারি তবে চলে কেমন করে বলুন তো? সবইতো বোঝেন স্যার। বলে লোকটি হা হা করে হাসতে লাগল।

জহর বোকা নয়। বুঝতে পারে যখন ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে একবার এসে ধরা দিয়েছে এবং তাদেরই গাড়িতে বসেছে। যমদুত সদৃশ দুজন তার পাশে রয়েছে। ওদের কোন প্রস্তাবেই রাজী না হয়ে উপায় নেই। ইচ্ছায় রাজী না হলে ওরা রাজী করাবে। কাজেই জহর গম্ভীরভাবে জবাব দিলে ঃ দাও বেঁধে!

সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো সিল্কের রুমালে জহরের চোখদুটো বাঁধা হয়ে গেল।

গাড়ি চলতে লাগল।

কিন্তু জহর তখন রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছে। হুট্ করে ও চলে এলো ওদের সঙ্গে এখন ওদের সর্দার যদি প্রীতম সিংকে চেনে তাহলেই তো ও যে প্রীতম সিং নয় সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে, তাছাড়া ওর কাছে যখন হীরাটা পাবে না তখন যে কি পরিস্থিতি হবে কে জানে! এই চলন্ত গাড়ি থেকে কোনমতে পালানও যায় না।

তাছাড়া সেও তো অসম্ভব, দুজনের হাত এড়িয়ে পালাবেই বা কেমন করে।

প্রায় ২০/২৫ মিনিট গাড়ি চলবার পর হঠাৎ একসময় ধীরে ধীরে গাড়িটা থেমে গেল।

আসুন। এসে গেছি। একজন বলে।

লোক দু'টি জহরের দু'পাশে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাল ওকে।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে ওরা এসে একজায়গায় দাঁড়াল।

একটা শব্দ শোনা গেল টক্ টক্! বোধ হয় কোন বন্ধ দরজার গায়ে টোকা দেওয়া হলো।

দরজা খোলার শব্দও শোনা গেল। বুঝতে পারছে জহর এবারে ওকে নিয়ে তারা একটা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

অনুমানে বুঝতে পারে লম্বা একটা টানা বারান্দা মত বোধ হয়। সেটা পার হয়ে ওরা আবার থামল।

দেখবেন সামনে সিঁড়ি।

সিঁড়ি বেয়ে ওরা উঠতে লাগল। কাঠের পুরাতন সিঁড়ি পায়েব ভারে মচ মচ শব্দ করে। যেন বেদনায় আর্তনাদ করছে।

হঠাৎ ওরা থামল।

জহর শুনলে ওদের মধ্যে একজন বলছে, প্রীতম সিংকে এনেছি কর্তা!

সঙ্গে সঙ্গে জহরের চোখের উপর হতে রুমাল খুলে নেওয়া হলো।

ছোট একটা ঘর!

একটা ছোট কাঠের টেবিল, তার সামনে একজন হোমরাচোমরা গোছের লোক বসে আছে। টেবিলের উপরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় জহর দেখলে, উপবিষ্ট লোকটির চোখ দুটো যেন নেকড়ের চোখের মত হিংসায় ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। ভারী মোটা গলায় লোকটি ক্ষণমাত্র জহরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, এ কি! এ তো প্রীতম সিং নয়। এ কাকে এনেছিস.?

জহর বুঝলে লোকটা প্রীতম সিংকে সত্যি সত্যিই চিনতো, অতএব এখানে আর চাতুরি চলবে না।

পরক্ষণেই লোকটি আবার বললে, তোমাকে আমি চিনি। তোমার নাম জহর না? একে তোরা কোথায় পেলি?

লোক দুটি এতক্ষণ কর্তার কথা শুনে পরম বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করছিল, তারা সব কথা খুলে বললে।

হুঁ, আচ্ছা ও এখানে থাক। তোরা এখুনি আবার হোটেলে ফিরে যা। সেখান থেকে প্রীতম সিংকে খুঁজে নিয়ে আসা চাই। যা।

লোকদুটো নিঃশব্দে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

তারপর জহর তুই প্রীতম সিংয়ের ঘরে কি করছিলি? লোকটা শুধায়।

আমি প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে তার ঘরে গিয়েছিলাম, এমন সময় তোমার লোকরা সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু আমার কোন দোষই নেই, আমি বার বার বলেছি যে আমি প্রীতম সিং নই কিন্তু তোমাব লোকেরা আমার কথা বিশ্বাস করলো না। আমাকে জোর করে এখানে ধরে নিয়ে এলো।

একটা কাতরতা জহরের কণ্ঠে ফুটে ওঠে কারণ এতক্ষণে বিখ্যাত গুণ্ডা কালু খাঁকে জহর চিনতে পেরেছে।

হোঃ হোঃ করে হঠাৎ কালু খাঁ বাজের মত তীক্ষ্ণ হাসি হেসে ওঠে।

সেই ভয়ংকর হাসির শব্দ দেওয়ালে দেওয়ালে যেন একটা ভৌতিক বিভীষিকায় ঝম্‌ঝম্ করে ওঠে।

বাঃ বেড়ে চাল চেলেছিস তো। কিন্তু ওতে আমি ভুলছি না। আপাততঃ তুই আমার কাছে বন্দী থাকবি, যতক্ষণ না প্রীতম সিংয়ের খবর পাই। তারপর তোর ব্যবস্থা হবে।

ঐ ঘটনার দিন দুই বাদে হতভাগা জহরের মৃতদেহ রাস্তার ধারে ফুটপাতে পাওয়া গেল। নিষ্ঠুরভাবে গলায় ছুরি চালিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

পরে পুলিস তদন্ত করে অবিশ্যি জেনেছিল, প্রীতম সিং নামে দু'জন লোক অ্যাভিনু হোটেলে ছিল। নিরপরাধ প্রীতম্ সিং যার সঙ্গে হীরার কোন সম্পর্কই ছিল না জহর তাকেই হীরা চোর প্রীতম্ সিং বলে ভুল করেছিল এবং সেই হতভাগ্যেরই জহরের হাতে মৃত্যু হয়।

অন্য প্রীতম সিং গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ে। যে প্রীতম সিং গা ঢাকা দিয়েছিল তার কাছেই নাকি আমীর খাঁর হীরাটা ছিল। যা হোক হীরার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

এমনি করে আমীর খাঁর অভিশপ্ত হীরার জন্য প্রথমে আবদুল, দ্বিতীয় নিরপরাধী এক প্রীতম সিং এবং তৃতীয় জহরের মৃত্যু হলো। কিন্তু অভিশপ্ত হীরার কোন সন্ধানই হলো না।

পাঁচ

দিলীর খাঁর সিগারেটটা নিঃশেষিত হয়ে গি'য়ছিল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করে সেটায় অগ্নিসংযো' করতে করতে খাঁ সাহেব আবার বললেন ঃ আপনি হয়ত আশ্চর্য হচ্ছেন সুন্দর সিং, কেমন করে আমি জহর ও প্রীতম সিংয়ের ঘটনা জানলাম, না? কালু খাঁ উক্ত ঘটনার দেড় বৎসর পরে বক্সারে অন্য একটা খুনের মামলায় ধরা পড়ে এবং বিচারে তার ফাঁসী হয়। আমি সে সময়.লাহোর জেলে কিছুদিনের জন্য বদলী হয়ে গিয়েছিলাম। বিচারের সময়ই কালু সব খুলে বলেছিল।

সুন্দর সিং প্রশ্ন করলেন, আসল হীরা চোর প্রীতম সিংয়ের তাহলে কী হলো?

আসল প্রীতম সিং?

হাঁ, আসল প্রীতম সিংয়ের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল কি?

আসল অর্থাৎ সেই হীরা চোর প্রীতম সিংয়ের কথা বলতে হলে তার আগে আপনাকে পাঠান দস্যু আনোয়ার খাঁর কথা বলতে হয়। আনোয়ার খাঁর ফাঁসি হয় পিণ্ডি জেলে। আমি তখন পিণ্ডি জেলে কাজ করছি। পাঠান দস্যু সর্দার আনোয়ার খাঁর বাড়ি ওয়াজিরিস্থানে। বহুবার সে ছোট বড় নানা অপরাধে জেল খেটেছিল। পুলিসের খাতায় তার নামটা বেশ ভাল ভাবেই দাগ দেওয়া ছিল। আনোয়ার খাঁর একটি মাতৃপিতৃহারা ছোট ভাই ছিল। নাম তার কুতুব। কুতুবের বয়স তখন ১৫ কি ১৬ বৎসর। আনোয়ার তার ভাই কুতুবকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসত! নিজের সমস্ত গতিবিধি অতি যত্নে আনোয়ার ছোট ভাই কুতুবের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত। কুতুব কোনদিনও জানতে পারেনি কি ভাবে তাদের সংসার চলতো। এবং তার দাদা আনোয়ার কী ভাবে কি উপায়ে এত টাকা রোজগার করত। আনোয়ার যখন জেলে যেতো, সে তার ভাইটির সকল দেখা শুনার ভার তার এক দুর সম্পর্কীয় ভাই সামসেরের উপর দিয়ে যেত। রাওলপিণ্ডিতে সামসেরের প্রকাণ্ড ফলের দোকান ছিল, আনোয়ারের

সমস্ত চোরাই মালের বেচাকেনা সামসেরের ফলের দোকানেই হতো।

আনোয়ার যেবারে ধরা পড়ে সে সময় কিছুদিনের জন্য আনোয়ার তার ভাই কুতুবকে নিয়ে বেনারসে চকের কাছে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া করে বাস করছিল।

বেনারসে?

হাঁ—কারণ অজ্ঞাতবাস চলছিল তার তখন।

কি নাম ছিল তখন তার?

তখনকার তার ছদ্মনাম ছিল এনায়েৎ উল্লা খান!

তারপর?

খান সাহেব বড় একটা বাড়ি থেকেও বের হতো না।

সর্বদা বাড়িতেই থাকত বুঝি।

হাঁ।

কুতুবের তখন স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ। দিলীর খাঁ আবার বলতে লাগলেন।

কয়েকদিন থেকে খান সাহেব সন্ধ্যায় কোথায় বের হয়ে যেত, ফিরত সেই রাত্রে।

আষাঢ় মাস, বেনারসে তখন প্রচণ্ড গরম।

গা হাত পা যেন পুড়ে যায়।

আকাশে বৃষ্টির নাম গন্ধ পর্যন্ত নেই।

দুপুরের দিকে সেদিন সমস্ত আকাশটা হঠাৎ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল।

আসন্ন একটা ঝড়ের পূর্বাভাষ যেন আকাশে বাতাসে সূচিত হচ্ছে।

দোতলার একটা ঘরে সব জানালা দরজা এঁটে একটা টেবিলের দু'ধারে খান সাহেব ও কুতুব মুখোমুখি বসে।

খান সাহেব বলছিল, শীঘ্রই আমরা পেশোয়ারে চলে যাব কুতুব। সেখানে কিছুদিন এবার থাকব। ভাবছি তোকেও সেখানকার স্কুলে ভর্তি করে দেবো।

কুতুব শুধায়, কবে ভাইজান?

প্রশ্নটা করে বটে কুতুব তবে আনোয়ার জানত না যে ইদানীং কুতুব তার দাদার বিচিত্র গতিবিধি একটু একটু করে জানতে পেরেছিল।

তার কিশোরমনে এই ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্টাস্পষ্টি না হলেও একটা

কৌতূহল ও উত্তেজনা যেন দোলা দিয়ে দিয়ে উঠত। তার শরীরের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত পাঠান রক্ত যেন কি এক উত্তেজনায় টগবগিয়ে উঠত। লেখাপড়া আজকাল আর তার ভাল লাগে না।

ঘরের কোণে শান্তশিষ্ট হয়ে নিঝুমভাবে বসে থাকতেও যেন তার আর ভাল লাগে না আজকাল।

ছোটবেলায় সে তার দাদার মুখে গল্প শুনত, একদা তাদের পূর্বপুরুষরা দুর্ধর্ষ খুনে ডাকাত ছিল।

খাইবার পাসের আশে পাশে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে ঘোড়ার পিঠে চেপে সারাটা গ্রীষ্মকাল ডাকাতি করে বেড়াত।

লম্বা ছয় ফিট সাড়ে ছয় ফিট সব দীঘল বলিষ্ঠ দেহ।

রঙীন পেশোয়ারী ঢলঢলে কাবলী পায়জামা। উপরে কোর্তা।...

মাথায় সবুজ পাগড়ী।...

কোমরে ঝক্‌ঝকে ছোরা ও কাঁধে বন্দুক।

উদ্ধত বেপরোয়া দুর্ধর্ষ জীবন যাত্রা।

তেজী কালো ঘোড়ার পিঠের উপরে চেপে তারা পাহাড় হতে পাহাড়ে ছুটে ছুটে যেত। পাহাড়ের পাষাণকঠিন গাত্র ঘোড়ার খুরের লৌহ নালের আঘাতে আগুন ছড়াত।

তারপর যেই শীত সমাগমে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে বরফ পড়তে শুরু করতো সবাই হতো গৃহমুখী।

এখন কিছুদিন বিশ্রাম।

ঘরের মধ্যে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে ঘিরে বসে চলত নানা খোস গল্প।

শীতের শেষে বসন্ত তারপরই আবার গ্রীষ্ম—ওরাও ঘোড়ার পিঠে চেপে পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে দল বেঁধে বের হয়ে পড়ত।

কুতুবের ইচ্ছা হতো ঐরকম উদ্ধত বেপরোয়া জীবন কাটায়।

ইচ্ছা করতো জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে গভীর রাতের অন্ধকারে ধারালো ছুরিখানা দাঁতে চেপে ধরে, কঠিন উত্তুঙ্গ খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে সরীসৃপের মত উপরে উঠে যেতে।

বসে বসে একা একা কত দিন থাকবে কুতুব।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি...দূর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে একফালি বাঁকা চাঁদ। দূরে বহুদূরে খর্জুর বৃক্ষের সরু চিকণ পাতায় পাতায় আলোছায়ার ঝিলমিলি।

বুদ্ধিমান আনোয়ার ভাইয়ের মনের হাবভাব দেখে ইদানীং ক্রমে একটু একটু করে ভাইকে জাগিয়ে তুলেছিল। আজকাল সে কিছু কিছু ভাইকে বলে।

আনোয়ার বলছিল কালই সন্ধ্যায় আমি চলে যাবো কুতুব, তুমি পরশু পেশোয়ারের দিকে রওনা হবে। পুলিস আমার অনুসন্ধান বোধ হয় পেয়েছে, আর এখানে গা ঢাকা দিয়ে বোধ হয় থাকা যাবে না।

ব্যাপার কী ভাইজান? কুতুব প্রশ্ন করলে।

এবারে এমন একটা বস্তুর ধাঁধায় ঘুরছি ভাই, যদি সেটা পাই, তবে সারা জীবনে আর আমাদের অর্থের কোন চিন্তাই থাকবে না। একেবারে ভেল বদলে বাকী জীবনটা ইরাকে গিয়ে দু'ভায়ে কাটিয়ে দেবো।

জিনিসটা কী ভাইজান?

কাউকে ঘুণাক্ষরে বলো না কথাটা, লাহোরের নবাব আমীর খাঁর সেই কমল হীরাটা!...চাপা গলায় আনোয়ার বললে।

কুতুব যেন থম্‌কে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইল। হীরাটার কথা ও বহুবার শুনেছে। ঐ দাদার মুখেই।

আর এও শুনেছে কজনা প্রাণ দিয়েছে ঐ হীরাটার জন্য। অভিশপ্ত হীরা।

কিন্তু ভাইজান, কাজটা কী খুব সুবিধাজনক হবে? একটা ভয়মিশ্রিত কাতরতা কুতুবের কণ্ঠে ঝরে পড়ে।

হবে, হবে—শোন না বলি! কাল আমি যাবো পরশু তুমি এই জায়গা ছেড়ে যাবে। আপাততঃ এই ঠিক রইলো। বেনারসের বিখ্যাত জুয়েলার আনন্দরাম শেঠজী এই সুয়োগ দিচ্ছেন। অনেক পরিশ্রম ও অনেক অর্থ ব্যয় করে শেঠজী হীরাটা বাগিয়েছেন কিন্তু নিজে তিনি হীরাটা রাখতে সাহস পান না। তাই হীরাটা বেচে দি ে চান যত শীঘ্র সম্ভব। কেন না প্রীতম সিং নাকি হীরাটা শেঠজীর কাছে আছে কোনমতে জানতে

পেরেছে।

কে এই প্রীতম সিং দাদা?

যে দল থেকে শেঠজী হীরাটা বাগিয়েছেন, প্রীতম সিং তাদেরই দলের একজন। কিন্তু যা বলছিলাম, প্রীতম সিং সে কথা জানতে পেরে শেঠজীর কাছ থেকে হীরাটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। অবশ্যি শেঠজী প্রীতম সিংকে ভয় করলেও আমি তাকে ভয় করি না। প্রীতম সিং জানে না পাঠান সর্দার আনোয়ার খাঁ প্রীতম সিংয়ের মত দু'চারটে বদমাশকে অনায়াসেই হাতের আঙুলে টিপে ছারপোকার মতই মারতে পারে ইচ্ছা করলে। বোকা, বোকা লোকটা, একদম বোকা। নইলে প্রীতম সিং শেঠজীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করে! শেঠজী লোকটা ভয়ংকর ধড়িবাজ ও চালাক। সে প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে একটা চাল চেলেছে। সে প্রীতম সিংকে বলেছে, নিজে সে হীরীটা রাখতে চায় না, প্রীতম সিংয়ের হাত দিয়ে লক্ষ্ণৌতে এক বিখ্যাত মার্চেন্টের কাছে এখান থেকে বরাবর মোটরে করে হীরাটা পাঠিয়ে দিতে চায়। কথা হয়েছে আমিও প্রীতম সিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে যাবো। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটা বাড়িতে রাত্রি বারটায় প্রীতম সিং আসবে। আমি তার সঙ্গে সেখানে গিয়ে মিলিত হবো। তারপর দু'জনে একসঙ্গে আজ রাত্রে মোটরে করে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করবো। কাল দুপুরে তুমি বাড়িওয়ালাকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে বলবে, সকালের ট্রেনে আমি বিশেষ একটা কাজে লক্ষ্ণৌ চলে গেছি। পরশু তুমি পেশোয়ার চলে যাবে।

ছয়

রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা হবে।

কুতুব পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রায় ঘণ্টা দুই অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টি হবার পর, জলঝড় এখন থেমেছে।

আনোয়ার জামাটা গায়ে দিল। দরজায় তালা দিয়ে গলিপথে এসে দাঁড়াল।

আকাশ তখনও মেঘে মেঘে অন্ধকার। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

মাঝে মাঝে এক ঝলক বৃষ্টিকণাবাহী হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জল জমে গেছে।

দোকানপাট সব বন্ধ। চকের দু'একটা পানের দোকান তখনও খোলা।

আনোয়ার দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

বিশ্বনাথের গলির ঠিক মুখেই বসন্তর পানের দোকান।

পানের দোকানে কোন খরিদ্দার নেই, কেবল একা বসন্ত সেদিনকার রোজগারের পয়সাগুলো গুনছে বসে।

আনোয়ার এসে বসন্তর পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল।

কে, খান সাহেব! এত রাত্রে কি ব্যাপার? বসন্ত মুখ তুলে তাকাল।

বসন্তর মুখের কথা শেষ হয় না। ঐ সময় পানের দোকানের সামনে একটা টাঙ্গা এসে দাঁড়াল।

মুসলমানী কায়দায় পায়জামা ও পাঞ্জাবী গায়ে একজন ঢ্যাঙ্গা লোক টাঙ্গা থেকে নেমে, টাঙ্গাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে পানের দোকানের সামনে এগিয়ে এল!

সেলাম আলেকম্ খান সাহেব!

এই যে সিংজী এসে গেছো!

সব ঠিক হ্যায়?

হাঁ। চল আমার বাড়ির দিকে যাওয়া যাক! শেঠজীর লোক সেখানেই আসবে।

চল!

দু'জনে পানের দোকান ছেড়ে বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকল।

অন্ধকার নির্জন গলিপথ।

পায়ের নীচে কাদাজল প্যাচ-প্যাচ করছে।

সমস্ত দোকান পাট বন্ধ।

দু'জনে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

সহসা এমন সময় পিছন থেকে আচমকা একটা দড়ির ফাঁস প্রীতম সিংএর গলায় পরিয়ে দিয়ে আনোয়ার একটা হেঁচকা টান দিল।

অতর্কিতে পিছন হতে আক্রান্ত হয়ে প্রীতম সিং রাস্তার উপরে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ার একটা তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি কোমর থেকে টেনে বের করে ভূপাতিত প্রীতম সিংএর বুকে বসিয়ে দিল।

রজনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার গলিপথে মুহূর্তে প্রীতম সিং শেষ হয়ে গেল। কেউ দেখলে না, কেউ জানলে না।

আনোয়ার যখন বুঝলে প্রীতম সিং শেষ হয়ে গেছে তখন ও তাড়াতাড়ি প্রীতম সিংএর জামা কাপড় তল্লাস করতে শুরু করে দিল এবং অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকারে আনন্দে ওর মুখ ঝলমল করে উঠল।

প্রীতম সিংএর ট্যাঁকে একটা ছোট্ট টিনের কৌটা ছিল সেটা ট্যাঁক থেকে বের করে তাড়াতাড়ি জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিল, তারপর নীচু হয়ে প্রীতম সিংয়ের অসাড় মৃতদেহটা কাঁধের উপরে অক্লেশে তুলে নিল।

আনোয়ার প্রীতম সিংয়ের মৃতদেহটা বহন করে অন্ধকার গলিপথে অগ্রসর হলো। কাশীর অলিগলি তার নখদপর্ণে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আনোয়ার প্রীতম সিংয়ের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হলো।

অন্ধকারে গঙ্গা কল কল ছল্ ছল্ করে একটানা বহে চলেছে।

কতকগুলো নৌকো ঘাটে বাঁধা।

কিন্তু কেউ কোথাও জেগে নেই!

নিঃশব্দে প্রীতম সিংয়ের মৃতদেহ বহন করে সিঁড়ি বেয়ে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল আনোয়ার।

তারপর মৃতদেহটা জলের মধ্যে টেনে নিয়ে স্রোতের মুখে ছেড়ে দিল।

গঙ্গা একটানা বহে চলল।

গঙ্গার স্রোতে বেশীদূর যেতে পারেনি ভেসে মৃতদেহটা, পরের দিন দশাশ্বমেধ ঘাটের কিছু দূরে একটা নৌকোর সঙ্গে প্রীতম সিংয়ের মৃতদেহ ঠেকে আছে দেখা গেল।

পুলিস এলো ঘটনাস্থলে।

পানওয়ালা বসন্তও ভিড়ের মধ্যে ছিল, সেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে মৃতদেহ সনাক্ত করলে এবং গত রাত্রের সব কথা বললে।

পুলিস এসে আনোয়ারের বাড়ি ঘেরাও করলে।

আনোয়ারকে পাওয়া গেল না বটে কিন্তু কুতুব ধরা পড়ল পুলিসের হাতে।

আনোয়ার পরের দিন সকালে ট্রেন ধরতে পারেনি, কাশীতেই আত্মগোপন করে ছিল।

পুলিস সর্বত্র আনোয়ারের সন্ধানে ফিরতে লাগল।

চতুর্থদিন দ্বিপ্রহরে গোধূলিয়ায় এক গাড়ির আস্তাবলে আনোয়ার ধরা পড়ল।

সুন্দর সিং এই সময় হঠাৎ বলে উঠলেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত প্রীতম সিং আনোয়ারের হাতেই খুন হলো? হীরাটা নিশ্চয়ই পুলিস আনোয়ারের কাছ থেকে উদ্ধার করল?

দিলীর খাঁর মাথা নেড়ে বললে, না এমন কথা তো আমি বলিনি যে, প্রীতম সিংই খুন হয়েছিল, তাছাড়া হীরাটাও পাওয়া যায়নি।

কিন্তু আপনিই তো একটু আগে বললেন, আনোয়ার তো প্রীতম সিংকেই খুন করেছিল সে রাত্রে।

আনোয়ার নিজেও তাই জানত বটে কিন্তু আসলে সে প্রীতম সিং নয় যাকে সে খুন করেছিল।

তবে কে সে?

তা জানা যায়নি তবে যে মৃতদেহটা প্রীতম সিংয়ের বলে সনাক্ত করা হয়েছিল পুলিসের দপ্তরে রক্ষিত প্রীতম সিংয়ের ছবির সঙ্গে তার সামান্য একটু আধটু মিল থাকলেও, অমিলও অনেক কিছুই ছিল। তা ছাড়া আনোয়ার ছুরি দিয়ে প্রীতম সিংয়ের (?) মুখটা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। খুব ভাল করে চেনবারও উপায় ছিল না।

তাহলে শেঠজীই সব চালাকি খেলেছিলেন, নিশ্চয়ই একটা নকল হীরা প্রীতম সিংয়ের হাত দিয়ে তাকে ল'ক্ষ্ণৌ পাঠাচ্ছিলেন, এবং ইচ্ছা করেই দুর্দান্ত দস্যু আনোয়ারকে ওর সঙ্গী নিযুক্ত করেছিলেন এবং আনোয়ারকে সব কথা বলেছিলেন, যাতে করে আনোয়ারই হীরার লোভে শেষ পর্যন্ত প্রীতম সিংকে খুন করে! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

আপনি ঠিকই বলেছেন, ঘটেছিলও ঠিক তাই, দিলীর খাঁ বললেন।

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না খাঁ সাহেব, এর পর পুলিস কেন শেঠজীকে গ্রেপ্তার করলে না?

পুলিস শেঠজীকে গ্রেপ্তার করবার সময়ই পেলে না, তার আগেই যে অনেক কিছু ঘটে গেল, এবারে আমি সেই গল্পেই আসছি।

দিলীর খাঁ থামলেন।

সাত

এমন সময়ে দিলীর খাঁর ভৃত্য এসে জানাল, কে একজন বাবু নাকি সুন্দর সিংকে ডাকছেন।

সুন্দর সিং ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন, দেখেছো একেবারে ভুলেই গেছি। মিঃ ঘোষাল এসেছেন নিশ্চয়ই, আজ রাত্রে তাঁর ওখানে আমার খাবার কথা ছিল। যাও, যাও এখানে তাকে নিয়ে এস। ভৃত্য চলে গেল এবং একটু পরেই ঘোষালবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। এই যে সুন্দর সিং তুমি এখানে? বেশ যাহোক, অপেক্ষা করে করেও যখন তুমি এলে না, তখন গেলাম তোমার বাড়ি। তোমার চাকর বললে, তুমি এখানে এসেছো!

সুন্দর সিং বললেন, হাঁ খাঁ সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই। এসো এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি এখানকার জেলর দিলীর খাঁ, আর ইনি আমার বিশেষ বন্ধু মিঃ এস্ কে ঘোষাল।

সুন্দর সিং পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের আলাপ করে দিলেন।

দিলীর খাঁ বললেন, মিঃ ঘোষাল, আপনার বন্ধুকে এতক্ষণ এখানে আটকে রাখবার জন্য দায়ী আমিই। ওঁকে লাহোরের নবাবের ইতিহাস-বিখ্যাত কমল হীরার কাহিনীটা বলছিলাম।...

বটে! যে হীরাটা অনেকদিন আগে চুরি গিয়েছিল আর পাওয়া গেল না? সংবাদপত্রে পড়েছিলাম বটে। হীরাটা পাওয়া গেছে নাকি!

না...তাই বলছিলাম—

মিঃ ঘোষাল গল্প শুনতে অত্যন্ত ভালবাসেন। বললেন, কী রকম? আমি শুনতে পারি না?

নিশ্চয়ই বসুন না, বলছি।...

মিঃ ঘোষাল একটা চেয়ারের উপরে চেপে বসলেন।

দিলীর খাঁ সংক্ষেপে কাহিনীটা বললেন। তারপর বললেন, শেঠজী পর্যন্ত এসেছি, এবারে শেঠজীর ব্যাপারটা বলবো। আপনি বলছিলেন, মিঃ সিং, হীরাটা পুলিসে শেঠজীর কাছে খোঁজ করলে না কেন! তার কারণ

পুলিসের লোক শেঠজীকে প্রশ্ন করবার কোন সুযোগই পায়নি।...আপনারা হয়ত জানেন, দিলীর খাঁ বলতে লাগলেন, পৃথিবীর কতকগুলো বিখ্যাত হীরা তাদের সঙ্গে ভয়ংকর সব কাহিনী জড়িত হয়ে আছে। কত রক্তপাত, কত খুন-খারাপী!...বিখ্যাত হীরা 'Tigers eye', 'Orloaff', 'Hope' তার প্রমাণ! কিন্তু এই নবাব আমীর খাঁর বিখ্যাত কমল হীরা বুঝি এদেরও ছাড়িয়ে গেছে।

দিলীর খাঁ পকেট থেকে একটা মোটা চুরোট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর মৃদুস্বরে আবার বলতে লাগলেন।

বিখ্যাত ধনী ও জুয়েলার আনন্দরাম শেঠজী লোকটি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও চতুর। লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বেনারস ও কলকাতায় ছিল তাঁর জুয়েলারীর ব্যবসা। সে পারত না এমন কাজ দুনিয়ায় খুব কমই ছিল। শেঠজী লোকটার শুধু জুয়েলারীর ব্যবসাই ছিল না। আরো একটা ঐ সঙ্গে গোপন ব্যবসা ছিল। ভারতের সর্বত্র নাম করা সব চোর ও শয়তানদের সঙ্গে তার চোরাই মালের বেচাকেনা চলতো।

কিন্তু কোনদিন ঘুণাক্ষরেও কেউ তা টের পায়নি। কেননা নিজেকে সর্বত্র সে অতি চাতুর্যের সঙ্গে আড়ালে লুকিয়ে রাখত। এতটুকু সন্দেহ করবারও তাকে কোন উপায় ছিল না। পুলিসের যদিও একটা সন্দেহ বরাবরই শেঠজীর উপর ছিল, তবু তারা উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কিছুই করতে পারত না। থাকত সে সব সময় বেনারসেই।

বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে সে একটা আধুনিক কেতায় বসত বাড়ি করে তাতে বসবাস করছিল।

সংসারে তার আপনার বলতে একটি মাত্র মেয়ে যমুনা।

ধনী পিতার কন্যা হয়ে যমুনা ছিল অত্যন্ত খেয়ালী ও বিলাসী।

বাড়িতে সর্বসমেত চারজন ভৃত্য ছিল। ওদের মধ্যেই একজন ছিল, সে ড্রাইভারেরও কাজ করত।

শেঠজীর দু'খানা গাড়ি ছিল।

যেদিন রাত্রে প্রীতমসিং (?) খুন হয় আনোয়ারের হাতে, সেদিন রাত্রি তখন প্রায় দুটো হবে, শেঠজী তাঁর শয়নকক্ষে ঘুমিয়ে আছে। তার একমাত্র কন্যা যমুনা পিতার ঘরে পাশাপাশি অন্য আর একটি শয্যাতেই

শয়ন করত সেও তার শয্যায় ঘুমিয়ে।

দিনে রাত্রে যখন তখন শেঠজীর সঙ্গে নানা জাতের, নানা স্তরের সব লোক দেখা করতে আসতো, নানা প্রকার চোরাই মালের বেচাকেনার ব্যাপারে।

চোরাই মাল নিয়ে যারা কারবার করত তারা সাধারণত গভীর রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে যাতায়াত্ করত।

এই সব কারণে শেঠজীর শয়নকক্ষে ঠিক তাঁর শয্যার পাশটিতেই থাকত একটা কলিং বেল ও সেই সঙ্গে থাকত কথা বলবার একটা মাউথ পিস্। বাইরের দরজার সঙ্গে ছিল এইটির যোগাযোগ এবং ঐ ব্যাপারটা একমাত্র চোরাকারবারীরাই জানে।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ বেলটা বেজে উঠ্ল টুং...টুং...টুং...

বেলের শব্দে তখুনি শেঠজীর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

শেঠজী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পাশের টিপয় হতে কথা বলবার মাউথ পিসটা তুলে ধরলেন ঃ কে?

ওপাশ থেকে জবাব এলো ঃ একবার অনুগ্রহ করে যদি নীচে আসেন শেঠজী। জরুরী কাজ আছে। একটা জিনিস আপনাকে দেখাতে চাই!

শেঠজী ভাল করেই জানতেন, আজ পর্যন্ত চোরাই মালের ব্যাপারীরা এইভাবে টিউবে বেচাকেনা বা মাল সম্পর্কে কোন কথাই মুখোমুখি ছাড়া কেন কখনো খুলে বলেনি বা বলতে চায় না।

কিন্তু ঐ সময় আমীর খাঁর ইতিহাস বিখ্যাত হীরাটা তার হস্তগত হওয়ায় শীঘ্র আর কোন চোরাই মাল কিনবার মত আর তেমন স্পৃহা ছিল না।

ইতিমধ্যে কখন যমুনাও জেগে গিয়েছিল, সে তার বাবাকে পাশের শয্যা থেকেই জিজ্ঞাসা করলে, কে বাবা, কী বলছে ও?

যমুনা পিতার গোপন ব্যবসা সম্পর্কে সব কিছুই জানত।

কে একজন কী একটা এনেছে সেইজন্য দেখা করতে চায়। শেঠজী জবাব দিলেন।

কোন মণিমুক্তা কী?

তাই হবে। তা ছাড়া আর এত রাত্রে আমার কাছে আসবে কেন?

শেঠজীর কণ্ঠস্বরে বেশ একটু বিরক্তির আভাস।

যাও না বাবা, নীচে গিয়ে একবার দেখই না। তুমি আমাকে একটা মুক্তার নেকলেস দেবে বলেছিলে? হয়ত লোকটার কাছে মুক্তার নেকলেস থাকতেও পারে।

শেঠজী চাপা গলায় সাবধানের সুরে বললেন, অত চেঁচিয়ে কথা বলিস নে। নীচে আশেপাশে কেউ থাক'লে এই টিউব দিয়ে সব শুনতে পাবে। তারপর আবার শেঠজী নলের সাহায্যে প্রশ্ন করলেন, নীচের অপেক্ষামান আগন্তুককে, কী আছে তোমার কাছে? আর কীই বা তুমি চাও?

জবাব এল, আপনার মেয়ে একটা মুক্তার হার চান না? নীচে এসে দেখুন ভাল মূল্যবান জিনিসই আছে। এরকম জিনিসটি আর হয়ত এ জীবনে পাবেন না।

বাকী কথাটুকু শেঠজী আর ভাল করে শুনতে পেলেন না, কেন না তাঁকে বাধা দিল তাঁর কন্যা যমুনা। বললে, যাও বাবা লক্ষ্মীটি! নিশ্চয়ই লোকটার কাছে মুক্তার মালাই আছে।

যাই দেখিগে, বলতে বলতে শেঠজী একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবলমাত্র মেয়ের অনুরোধেই শয্যা ছেড়ে উঠে, জামাটা গায়ে পরতে লাগলেন।

সোজা উপরে আমার কাছে কিন্তু নিয়ে আসবে বাবা। যমুনা বলে।

মুক্তার মালাই যে লোকটার কাছে আছে, তা তুই কি করে জানলি?

এ লোকটাই কয়দিন রাত্রে মাঝে মাঝে তোমাকে এসে ডাকাডাকি করে, কিন্তু কয়দিন থেকে তুমি শেষরাত্রে প্রায় বাড়ি ফের। তোমাকে বলতেও পারিনি।

তাই নাকি! এতই যদি দরকার তো নাম বলেনি কেন?

তা জানি না তবে ব্যাপারটা নাকি খুব গোপনীয়, তাই ও কিছুই প্রকাশ করতে চায় না কারো কাছে।

এর পর শেঠজী নীচে চলে গেলেন।

শেঠজী সোজা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে, বাইরের বসবার ঘরের সুইচ টিপে আলোটা জ্বালালেন।

তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললেন।

এই পর্যন্ত! এরপর আর শেঠজীকে কেউ জীবন্ত দেখেনি।

নীচের বসবার ঘরের পাশেই ভৃত্যদের থাকবার ঘর। এবং সিঁড়ির ধারের একটা ছোট ঘরে থাকত ড্রাইভার। ড্রাইভার নাকি শেঠজীর পায়ের শব্দ শুনেছিল, তিনি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসেন, তারপর দরজা খোলেন। সে তখন জেগেই ছিল।

সে কিছুই মনে করেনি, কেননা ইতিপূর্বে বহুবার তার প্রভু ওরকম মাঝেমাঝে রাত্রে নীচে নেমে এসে অনেকের সঙ্গে দেখাশুনা করতেন ও কথাবার্তা বলতেন।

দরজা খোলবার কিছুক্ষণ পরেই হলঘরে একটা ঝটাপটির শব্দ শোনা যায়। একটা চাপা ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর। তারপরই একটা পিস্তলের আওয়াজ এবং সেই সঙ্গে একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দ।

ড্রাইভার তখুনি দৌড়ে বাইরের ঘরে ছুটে যায়। এবং ততক্ষণে পিস্তলের শব্দে বাকী চাকরেরাও ঘুম ভেঙে ছুটে আসে। ড্রাইভার ঘরে ঢুকে দেখে, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, সদর দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা। আর মেঝের উপরে উবুড় হয়ে শেঠজী পড়ে আছেন। লাল রক্তে মেঝের অনেকখানি রাঙা হয়ে উঠেছে। ভৃত্যদের মধ্যে তখুনি একজন ছুটে উপরে গিয়ে শেঠজীর কন্যা যমুনাকে সংবাদ দেয়।

ড্রাইভারটি বেশ চালাক ও চতুর ছোকরা ছিল, তখুনি ফোনে পুলিসকে সংবাদ দেয়।

শেঠজীর মাথার মধ্যে দিয়ে গুলি চলে গিয়েছিল।

যমুনা ছুট্‌তে ছুট্‌তে নীচে নেমে এসে সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে একটা চিৎকার করে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

ঠিক এমন সময় একজন কনস্টেবল সেই বাড়িতে এসে প্রবেশ করে, ব্যাপার কী, এত গোলমাল কিসের, সে প্রশ্ন করল।

ড্রাইভার বললে, শেঠজীকে কে খুন করে গেছে।

আমি এখুনি বাড়ির আশপাশটা একবার ঘুরে দেখে আসছি, নিশ্চয়ই খুনী এখনও বেশী দূরে যেতে পারেনি। বলতে বলতে কনস্টেবলটি তখুনি বেরিয়ে গেল।

বাড়ির সামনেই ফুলের বাগান। নানাপ্রকার দেশী ও বিলাতী ফুলের

প্রাণ জুড়ানো সমারোহ। একপাশে টিনের সেড্ তোলা গ্যারেজ।

কনেস্টবলটি হাতের চোরা আলো ফেলে ফেলে চারপাশ অনুসন্ধান করতে লাগল। বাড়ির পিছন দিকে একটা গলিপথ। সব নির্জন, কিছুই সে দেখতে পেলে না। সে আবার শেঠজীর বাড়িতে ফিরে এল এবং বাড়ির সর্বত্র আবার ভাল করে খুঁজলে, কিন্তু কোথাও কিছু দেখা গেল না।

অবশেষে আবার সে বাগানে ফিরে গেল এবং বাগানটার সর্বত্র ভাল করে আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল। একটু আগে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হওয়ার জন্য বাগানে তখন বেশ খানিকটা জল জমে আছে এখানে ওখানে।

বৃষ্টিটা তখনো একেবারে থামেনি। টিপ্‌টিপ্ করে তখনও পড়ছে। অন্ধকার আকাশের বুকখানা চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চকিত আলোর ইশারা। মাঝে মাঝে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলি দোল খেয়ে টুপ্‌টাপ করে জলের ফোঁটা ঝরাচ্ছে।

হঠাৎ সে দেখতে পেলে পথের দুপাশের মেহেদীর কেয়ারীর সামনে একটা রিভলভার পড়ে আছে।...

আট

উৎসাহে আনন্দে লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হুঁ, এই যে পাওয়া গেছে, এটার সাহায্যেই নিশ্চয়ই খুনী হত্যা করেছে, এবং যাওয়ার সময় এখানে তাড়াতাড়িতে ফেলে দিয়ে গেছে, চাপা উত্তেজিত স্বরে কথাকটি বলতে বলতে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর সাহায্যে পিস্তলের নলটি চেপে ধরে তুলে নিল পিস্তলটি মাটি থেকে।

পিস্তলটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে সোজা ঘরে এসে ঢুকল। তারপর পিস্তলটি পাশের একটি টেবিলে রেখে পকেট থেকে নোটবুক বের করে, কী সব পেনসিল দিয়ে নোট লিখতে লাগল।

ইতিমধ্যে গোলমাল ও পিস্তলের শব্দ শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসে হাজির হয়েছেন এবং সদর দরজার সামনে ভিড় করে জটলা পাকাচ্ছেন।

তাদেরই মধ্যে একজন বেশ লম্বা ধরনের সুশ্রী যুবা পুরুষ ভিড় ঠেলে এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। তিনি একজন ডাক্তার। যমুনা তখনও একপাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি যমুনাকে পরীক্ষা করে তিনি ভৃত্যদের এসে বললেন, আমি ডাক্তার, উনি অজ্ঞান হয়ে আছেন, এখান থেকে ওঁকে উপরে নিয়ে চল।...

ইতিমধ্যে স্থানীয় থানার দারোগা পৌঁছে গিয়েছিলেন অকুস্থলে, হঠাৎ একজন ডাক্তারকে দেখে তিনিও যমুনাকে উপরে নিয়ে যাওয়ার কথাই বললেন।

ডাক্তারের নির্দেশক্রমে সকলে ধরাধরি করে যমুনাকে তার শোবার ঘরে উপরে নিয়ে গেল।

যমুনাকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার ভৃত্যদের কিছু গরম জল করে আনতে ও কোথাও একটু ব্রাণ্ডি আছে কিনা খুঁজে দেখতে তখুনি নির্দেশ দিলেন।

ভৃত্যেরা চলে গেল।

এদিকে দারোগাবাবু সকলের জবানবন্দী নিতে ব্যস্ত। হেড কোয়ার্টারে ফোন করে, পুলিস সার্জেনকে মৃতদেহ দেখবার জন্য আসতে বলে তিনি চেয়ার টেনে বসলেন।

প্রথমেই ড্রাইভার বনোয়ারী লালের ডাক পড়ল।

তুমিই ড্রাইভার বনোয়ারী লাল?

জি সাব্।

কতদিন এ বাড়িতে কাজ করছো?

সাত বছর সাব্।

প্রথমে তুমি ব্যাপারটা কেমন করে জানতে পারলে?

বিকেল থেকে খুব মাথা ধরেছিল বলে সন্ধ্যার সময় বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করছিলাম। একদম ঘুম হয়নি। রাত্রি তখন প্রায় দুটো হবে হঠাৎ এমন সময় কর্তার ঘরে বেল বাজছে শুনতে পাই।

নীচে তুমি যে ঘরে শোও, সেখান থেকে উপরের ঘরে বেল বাজলে শোনা যায় নাকি?

আজ্ঞে ঠিক তা নয়, তবে আমার ঘরের সঙ্গে ও বেলটার যোগাযোগ আছে, অনেক সময় রাত্রে কর্তা থাকেন না, আমিই জবাব দিই।

আশ্চর্য! আচ্ছা বল তো কেন রাত্রে তোমার কর্তার সঙ্গে এত লোকজন দেখা করতে আসত?

শুনেছি শেঠজীর মস্তবড় ব্যবসা। অনেকেই তাঁর সঙ্গে দিনে রাত্রে যখন তখন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা করতে আসত।

কিন্তু জুয়েলারীর বেচাকেনা যারা করে, তারা রাত্রেই বা বেছে বেছে আসত কেন? দিনের বেলাতে কি তাদের সময় হতো না তোমার কর্তার সঙ্গে দেখা করবার?

বনোয়ারী লাল দারোগার সোজাসুজি প্রশ্নে মাথাটা নীচু করলে।

কি হে? জবাব দাও, কি ধরণের লোক সাধারণত রাত্রে তোমার কর্তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো নিশ্চয়ই জান।

বনোয়ীরা লাল দারোগার প্রশ্নে মাথাটা চুলকাতে শুরু করলে।

কি হে জবাব দিচ্ছ না কেন? দারোগা ধমক দিয়ে ওঠেন।

আজ্ঞে আমি কি করে জানব বলুন। কারা আসত বা তাদের কি

পরিচয়, তবে সব রকমের লোকই দেখা করতে আসত।

দেখো হে, একটু সোজাসুজি ভাল মানুষের মত উত্তর দাও তো দেখি? সত্যি করে বল, সাধারণত কোন্ শ্রেণীর লোক, বিশেষ করে রাত্রে তেমার কর্তার সঙ্গে দেখা করতে আসত? তারা কি কিছু বেচা কেনা করতেই আসত?

আজ্ঞে সেই রকমই আমার মনে হয়।

হুঁ! আচ্ছা কি ধরণের জিনিস বেচতে আসত তারা?

তা আমি সঠিক বলতে পারবো না।

দারোগা সাহেব এবারে নিজমূর্তি ধরলেন, সগর্জনে রীতিমত দারোগা চালে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি বলতে পার। তা না হলে তোমার ঘরের সঙ্গেই বা কলিং বেলের যোগাযোগ থাকবে কেন? নিশ্চয়ই এমন লোকদের সঙ্গে তিনি বেচাকেনা করতেন যারা বিশেষ করে দিনের আলোয় তার কাছে আসতে সাহস পেত না!

হতে পারে।

মণি মুক্তা জহরতের বেচা কেনা হতো, হতে পারে না তাই। সত্যি করে বল, না?

'তা ঠিক আমি বলতে পারি না।

দারোগা একবার এ. এস্. আইয়ের দিকে তাকালেন, সে বনোয়ারীর জবানবন্দী গভীর মনোযাগের সঙ্গে লিখে নিচ্ছে দেখলেন। আবার তিনি বনোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, যারা এইভাবে তোমার কর্তা শেঠজীর কাছে যাতাযাত করত, তাদের দু'একজনের নাম তুমি বলতে পার বা তাদের আবার দেখলে চিনতে পারবে?

না। তবে ইদানীং একজন প্রায়ই রাত্রে কর্তার সঙ্গে দেখা করতো আসতো, কর্তার মুখে দু'একবার তার নামটা শুনেছি। তার নাম প্রীতম সিং।

দারোগা সাহেবের দৃষ্টিটা প্রখর ও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ক্ষণকাল চুপ করে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, আর কারো নাম জান?

আজ্ঞে না!

বলতে পার আজ রাত্রে কে তোমার কর্তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

না, তার গলার স্বর আমি চিনতে পারিনি। তবে মনে হয় আজ রাত্রে যে কর্তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, কয়েকদিন থেকে প্রায় প্রতি রাত্রেই সে কর্তার খোঁজে আসছিল। কারণ কর্তা ৫/৬ দিন এখানে ছিলেন না, লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন।

এ থেকে বোঝা যায় তোমার স্মৃতিশা ক্ত বেশ ভালই, বিশেষ করে কারো গলা শুনে মনে রাখবার শক্তি তোমার আছে। আপন মনেই কতকটা স্বগোক্তির মতই কথাটা বলে জনান্তিকে বললেন, তা হলে ঐ লোকটি কয়দিন থেকে রাত্রে এখানে আসা যাওয়া করছিল?

আজ্ঞে। প্রথম রাত্রে বেল শুনে আমি পরদিন সকালে কর্তার মেয়েকে সে কথা বলেওছিলাম। তাতে তিনি বলেন এবারে লোকটা এলে যেন তার সঙ্গে কথা বলতে দিই।

তারপর?

নয়

বনোয়ারী আবার ইতঃস্তত করতে থাকে।

দারোগা সাহেব আবার হুমকি দেন, তুমি নিশ্চয়ই জান কেন সে তোমার মনিবের খোঁজ করছিল—সত্যি কথা যদি এখনও না বল তো—তোমাকে হাজতে চালান করে দেবো—

--দোহাই হুজুর--আমি নির্দোষ।

—তবে বল।

হাঁ, আমি জানি। লোকটা বলেছিল তার কাছে একটা বহুমূল্য মুক্তার হার আছে। আমাদের কর্তা তার মেয়েকে একটা মুক্তার হার দেবেন বলেছিলেন। তাই বোধ হয় তিনি লোকটার সঙ্গে নিজে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লোকটা তাতে রাজী হয় না।

কেন?

বোধ হয় তো লোকটা হাতে হাতে নগদ টাকা চাইছিল, কর্তা ছাড়া আর কে তাকে নগদ টাকা হাতে হাতে দেবে বলুন। বোধ হয়, সেইজন্যই লোকটা আর কারো সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে রাজী হয়নি।

হুঁ। তাহলে ঐ লোকটাই আজ রাত্রেও এসেছিল?

আজ্ঞে। আমার তো তাই মনে হয়।

আচ্ছা, বনোয়ারী লাল, এখন তুমি যেতে পার। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেও না, বুঝলে?

এরপর আর সব ভৃত্যদেরও জবান-বন্দী নেওয়া হলো, কিন্তু বিশেষ কোন সূত্র পাওয়া গেল না।

কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি বনোয়ারীকে ডেকে পাঠালেন ঃ শোন বনোয়ারী, আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

তুমি অনেকদিন এ বাড়িতে চাকরী করছো, তোমার কর্তার কোন শত্রু ছিল বলে তোমার মনে হয়?

আজ্ঞে, তা আমি জানি না।

যারা তাঁর সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে আসতো, তাদের সঙ্গেও কখনও তোমার কর্তার কোন শত্রুতা বা রাগারাগি ছিল না বা হয়নি?

আজ্ঞে যারা আমার কর্তার সঙ্গে রাত্রে দেখা করতে আসতো তাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই আমি জানি না। তাছাড়া তাঁর মাহিনা করা ভৃত্য আমি, ওসব সংবাদেই বা আমার কি প্রয়োজন বলুন! গরীব মানুষ আমি!

আচ্ছা যাও!

এরপর দারোগা সাহেব যমুনার সংবাদ নিতে উপরে চললেন।

যমুনা তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে।

বিছানার উপরে একটা ভারী চাদরে গা ঢেকে যমুনা শুয়ে আছে।

পাশেই একটা চেয়ারে আগন্তুক ডাক্তার বসেছিলেন।

দারোগা সাহেবকে ঘরে ঢুকতে দেখে ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

এই যে ডাক্তারবাবু, বসুন বসুন, আপনার নামটি তো জানা হয়নি এখনো।

আমার নাম ডাঃ এনায়েৎ উল্লা খাঁ।

পাশেই থাকেন বুঝি কোথাও?

আজ্ঞে না, এখানে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। ক্যাণ্টনমেণ্টের আর এক বন্ধুর বাড়িতে আমার ও আমার বন্ধুটির নিমন্ত্রণ ছিল। ফিরতে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল, এই রাস্তা দিয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় এ বাড়িতে গোলমাল শুনে ব্যাপার কি দেখতে আসি। বন্ধুটি আমার একটু ভীতু, তিনি আগেই সরে পড়েছেন, খুন-খারাপী দেখে। বলে ডাক্তার একটু হাসলেন।

দারোগা সাহেবও না হেসে থাকতে পারলেন না, আপনার বন্ধুটির নাম কি?

বন্ধুর নাম মজাহর খাঁ। চকে বেনারসী শাড়ির মস্তবড় কারবার আছে।

হুঁ। তাঁকে না চিনলেও তার নাম শুনেছি। তারপর যমুনা দেবী এখন কেমন আছেন? কয়েকটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

অতি বড় প্রিয়জনের আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা সামলাতেও পারেননি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, এখন ভালই। আচ্ছা নমস্কার। আমি তা হলে

আসি, আমাকে নিশ্চয়ই আর আপনার প্রয়োজন নেই?

না। আচ্ছা আপনি যেতে পারেন। নমস্কার।

ডাক্তার এনায়েৎ খাঁ ঘর হতে ধীর পদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

দারোগা সাহেব যমুনার শয্যার পাশে এগিয়ে এলেন, আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যমুনা দেবী।

চোখ চেয়ে তাকাল এবং ক্লান্ত অবসন্ন স্বরে যমুনা বললে ঃ বলুন?

আপনি চিন্তিত হবেন না যমুনা দেবী। আমরা নিশ্চয়ই আপনার পিতার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবো। আচ্ছা, আপনার পিতার কেউ শত্রু ছিল বলে আপনি জানেন?

শত্রু!...

হ্যাঁ—তা ঠিক আমি জানি না দারোগা সাহেব।

একটা কথা শুনলাম, আপনাদের ড্রাইভার বনোয়ারীর কাছে শেঠজী নাকি অনেকদিন ধরেই অনেক প্রকারের সন্দেহজনক লোকদের সঙ্গে গোপনে হীরা জহরতের ব্যবসা চালাচ্ছিলেন?

—বলতে পারবো না, তবে বাবার কাছে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকেই আসত—

তা আমি জানি যমুনা দেবী। আচ্ছা আপনি কী বলতে পারেন, কে আজ রাত্রে আপনার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

না। তবে লোকটার গলার স্বর একটু যেন ভাঙা ভাঙা মত শোনাচ্ছিল।

এরপর আরো দু'একটা মামুলি প্রশ্ন করে দারোগা সাহেব নীচে নেমে এলেন।

নীচে এসে তিনি কনস্টেবলটিকে প্রশ্ন শুরু করলেন, তোমার নাম মেহেতাব বলছিলে না?

আজ্ঞে হাঁ!...

গোধুলিয়া থানায় তুমি কাজ কর?

আজ্ঞে!

—এদিকে তুমি কেন এসেছিলে? এখানে তো তোমার ডিউটি নয়।

—না। এখন আমার ডিউটি ছিল না।

—তবে?

—এদিকে আমার এক বন্ধু থাকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

পিস্তলের আওয়াজ শুনেই এ বাড়িতে তুমি আস?

জি হাঁ! পিস্তলের আওয়াজ হবার কয়েক মিনিট আগেই! বন্ধুর বাড়ি থেকে আমি ফিরে যাচ্ছিলাম! পিস্তলের আওয়াজ হতেই আমি এদিকে ছুটে আসি।

তুমি যখন এ বাড়িতে আস কাউকে যেতে বা আসতে দেখেছো?

--জি হাঁ।

—কখন?

এই বাড়ির রাস্তাটি যেখানে স্টেশনে যাবার বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে আসতেই দেখলাম কে একজন বর্ষাতি গায়ে বেশ যেন একটু দ্রুত পদেই স্টেশনের দিকে চলে গেল। কিন্তু তখন তাকে দেখে বিশেষ কিছু আমার মনে হয়নি বলেই, তাছাড়া পিস্তলের আওয়াজের দিকে লক্ষ্য ছিল বলে এ বাড়িতেই বরাবর আমি চলে আসি।

অপদার্থ। আহাম্মক কোথাকার! লোকটাকে আগে আটকাতে পারলে না?

মেহেতাব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, আমি বিশেষ দুঃখিত স্যার।

কিছুক্ষণ দারোগা সাহেব অবনতমুখী মেহেতাবের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তারপর মৃদু গম্ভীর স্বরে বললেন, শোন মেহেতাব, আজ তোমাকে এক বছর আগেকার একটা গল্প বলব।...

এক বছর আগে লক্ষ্ণৌর এক নবাব বংশের এক হতভাগ্য হৃতসর্বস্ব নবাবপুত্র অনন্তরাম শেঠজীর কাছে একটা বহুমূল্য হীরার আংটি বিক্রী করতে আসেন। তাঁর নাম...সাহাবুদ্দিন. সব কিছু বিক্রী করে এই হীরার আংটিই তাঁর শেষ সম্বলে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শেঠজী তাঁকে চক্রান্ত করে হীরার আংটিটি বাগিয়ে নিয়ে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়। সাহাবুদ্দিন তখন পুলিসের স্মরণাপন্ন হন কিন্তু পুলিস তার কথায় কান দেয় না ঃ তাঁকে পাগল বলে তাড়িয়ে দেয়। মেহেতাব চেয়ে আছে দারোগা সাহেবের মুখের দিকে! তোমাকে এক্ষণে আমি চিনতে পারছি তুমিই সেই

ছদ্মবেশী হতভাগ্য নবাবপুত্র সাহাবুদ্দিন! তোমাকেই আমি শেঠজীর খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করলাম!...তাড়াতাড়ি একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করনি, তোমার জামার তৃতীয় বোতামটি নেই!...এই দেখ বোতামটি, শেঠজীর মৃতদেহ পরীক্ষা করবার সময় তার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে এটি আমি পেয়েছি!...কোন লোককেই রাস্তা দিয়ে তুমি যেতে দেখনি। সবই তোমার মিথ্যা, বানান গল্প! আমার ঐ কনস্টেবলটি রমজানও এই পাড়াতেই পাহারায় ছিল। ও গুলির শব্দ হবার আধঘণ্টা আগে এ বাড়িব দিকে তোমাকে আসতে দেখে!...

মেহেতোব নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর মৃদুস্বরে বললে আপনার কথাই ঠিক। শেঠজীর উপরে প্রতিশোধ নিতেই আমি কিছুদিন আগে পুলিসে নাম লিখিয়েছিলাম, এবং তদ্বির করে এখানে বদলী হয়ে এসেছি।

তোমার মুখ দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তোমাকে এর আগে দেখেছি। তোমার ডান গালের উপরে ঐ কাটা দাগটাই, তোমার কথা আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। তুমি যদি শেঠজীকে হত্যা সত্যিই না করে থাক—বিচারে তুমি নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে কিন্তু আপাততঃ তোমাকে অ্যারেস্ট করলাম।

দারোগা সাহেব সাহাবুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গে নিয়ে থানায় গেলেন।

আজ আমি পুলিসের ছদ্মবেশে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন শেঠজীকে আমি হত্যা করিনি।

দু'দিন পরে প্রীতম সিংয়ের মৃত্যুর ব্যাপারকে কেন্দ্র করে আনোয়ার ধৃত হবার পর যখন পুলিসের লোক এসে সেই আমীর খাঁর হীরাটার অনুসন্ধান করলে, শেঠজীর বাড়ির সর্বত্র বাক্স প্যাঁটরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও সেটা পাওয়া গেল না।

দিলীর খাঁ এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন।

দশ

সহসা সুন্দর সিং বলে উঠলেন, তবে কি আপনি এই কথাই বলতে চান খাঁ সাহেব, যে বুদ্ধিমান দারোগা চতুরতার সঙ্গে শেঠজীর খুনীকে অত সহজে ধরে ফেললেন, তিনি হীরাটা খুঁজে বের করতে পারলেন না?

গম্ভীর স্বরে দিলীর খাঁ শুধু বললেন : হাঁ, ঠিক তাই আমি বলতে চাই।

সুন্দর সিং বললেন, কিন্তু পুলিস তো আনোয়ার খাঁর কাছ থেকেই সংবাদ পেয়েছিল আসল হীরাটা শেঠজীর কাছেই আছে। তবে সেটা শেঠজীর বাড়িতে খুঁজে পাওয়া গেল না কেন?

শেঠজীর ঘরের পাশেই একটা ছোট কামরায় একটা লোহার সিন্দুকে শেঠজীর মূল্যবান হীরা জহরৎ থাকত। পরের দিন বাড়ি খানাতল্লাসী করবার সময় পুলিস দেখলে সিন্দুক খোলা, টানতেই সিন্দুকের দরজা খুলে গেল, এবং সিন্দুকের নীচেই চাবির গোছাটা পাওয়া গিয়েছিল। পুলিসের লোকেরা সিন্দুকের মধ্যে একটা রূপার কৌটোয় খানিকটা তুলো পেয়েছিল এবং সেই কৌটোতেই যে হীরাটা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তুলোর গায়ে ঠিক আমীর খাঁর হীরার আকারে খাঁজ বসেছিল। শুধু হীরাটাই ছিল। এখন কথা হচ্ছে কে চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে কৌটো থেকে হীরাটা চুরি করে নিয়ে গেল? নিশ্চয়ই কেউ হীরাটা সম্পর্কে জানত এবং সুযোগমত সবার অলক্ষ্যে চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে হীরাটা চুরি করে নেয়।

মিঃ ঘোষাল সহসা বলে উঠলেন : হয়েছে, আমি বলতে পারি হীরাটা কে চুরি করেছিল। মাত্র একজনের পক্ষেই সে সুযোগ ছিল! দারোগা সাহেব নিজেই স্বয়ং হীরাটা চুরি করেছিলেন।

গম্ভীর স্বরে মাথা নেড়ে দিলীর খাঁ বললেন, না।

তবে ড্রাইভার বনোয়ারী লালই চুরি করেছিল, সুন্দর সিং বললেন।

কিংবা চাকরদের মধ্যে কেউ একজন, মিঃ ঘোষাল আবার বললেন।

কিন্তু তবু দিলীর খাঁ নীরবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, না! না!...তারা কেউ নেয়নি!...আপনারা দুজনেই কেবল সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে ভুল ধারণা করছেন! সূত্র ধরে বিচার বুদ্ধির সাহায্যে এগুতে হবে! শুনুন, আমি তখন বেনারস জেলের জেলার, আমারই চোখের সামনে হতভাগ্য হৃতসর্ব্বস্ব নবাবপুত্র সাহাবুদ্দিনের শেঠজীর খুনের অপরাধে ফাঁসি হয়!...একটা জিনিস আপনারা জানেন না হয়ত সে সময়কার সংবাদপত্রগুলি যদি পড়তেন তবে দেখতেন, সাহাবুদ্দিনের বিচারের সময় জবানবন্দীতে একটা রহস্য জানা গিয়েছিল, সেটা হচ্ছে যে পিস্তলটি দিয়ে শেঠজীকে খুন করা হয়, সেটা শেঠজীরই নিজস্ব পিস্তল!...

সুন্দর সিং শুধু একটা শব্দ করলেন।

দিলীর খাঁ আবার বলতে লাগলেন, এর পক্ষে সরকার পক্ষের উকিল বলেন, বোধহয় শেঠজী নিজেই যখন সে রাত্রে নীচে সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, নিজেকে রক্ষা করবার জন্য আসবার সময় পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে আসেন। তারপর হয়ত দুজনে দুজনকে আক্রমণ করেন এবং তরুণ সাহাবুদ্দিন গায়ের জোরে শেঠজীর হাত থেকে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে শেঠজীকে গুলি করে।

সুন্দর সিং এবারে বললেন, বেশ তাই যদি হয়, এবং শেঠজীই যদি হীরাটা পেয়েছিলেন, তবে হীরাটা গেল কোথায়? কে চুরি করলে? দিলীর খাঁ একটু নড়েচড়ে বসলেন, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন ঃ

একটা কথা সর্বদাই আপনাদের মনে রাখতে হবে, যেসব খুনের কথা আমি বলছি, কোনটাই পর পর হয়নি। প্রত্যেকটা খুনই কমবেশী দু'চার মাস বা এক বছর তফাত তফাত হয়েছে এবং আপনাদের হয়ত একটা কথা সহজেই মনে আসা স্বাভাবিক, প্রত্যেকটি ঘটনাই আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানলাম কী করে? এর জবাব আগেই আপনাদের দিয়ে রাখি, জেলারের কাজে বিভিন্ন জেলে বিভিন্ন সময় থেকে আমি কিছুটা সংবাদ জানতে পারি। আর বাকীটা আমার দু'চারজন বিশিষ্ট পুলিস বিভাগের গোয়েন্দা বন্ধু আছেন, তাঁদের মুখে শোনা ও পুলিসের রিপোর্ট থেকে পাওয়া। নিজে যা জানতে পেরেছি ও আমার বন্ধুদের মুখে মুখে যা শুনেছি ও পুলিসের রিপোর্ট থেকে যা সংগ্রহ করেছি তাই জোড়া

তালি দিয়ে আপনাদের আমি বলছি! এমন কথা অবিশ্যি আমি বলতে চাই না যে, আমি যা বলছি তার বেশীর ভাগই সত্য ঘটনা। এর মধ্যে আমার কল্পনাও যথেষ্ট আছে। সত্যি ও কল্পনায় মিশিয়ে, আপনাদের আমীর খাঁর হারানো হীরা সংক্রান্ত, আবদুল, জহর, নকল প্রীতম সিং, কালু খাঁ, প্রীতম সিং (?) আনোয়ার, ও অনন্তরাম শেঠজীর নৃশংস মৃত্যু বা খুনের কাহিনী বলেছি কেমন করে সেই অভিশপ্ত হীরাটার পিছনে পিছনে নৃশংস হত্যালীলা ঘটে চলেছে। এবার শুনুন অষ্টম হত্যার কাহিনী।...

দিলীর খাঁ একটু থেমে আবার নবাব আমীর খাঁর অভিশপ্ত হীরার কাহিনী শুরু করলেন।

এবারের ঘটনাস্থল, বঙ্গদেশের একটা নামকরা সহর, গঙ্গার উপকূলবর্তী শ্রীরামপুর!...একদিন শীতের এক সকালে, শ্রীরামপুরে গঙ্গার এক খাঁড়ীর মধ্যে একজন জেলে হঠাৎ একটা মৃতদেহ জলে ভাসছে দেখতে পায়।

মৃতদেহটি একজন মাঝারী বয়স্ক লোকের। দোহারা চেহারা, কাঠামোটা বেশ শক্ত! দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামানো হলেও লোকটি যে ভদ্রঘরের নয়, তার চেহারা ও বেশভূষা থেকেই স্পষ্টই বোঝা যায়।

ডান দিকের পিঠে একটা ক্ষতচিহ্ন, বোধ হয় কোন তীক্ষ্ণ লম্বা ফলাওয়ালা ছুরি জাতীয় কোন অস্ত্রের সাহায্যে লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে। ডান দিকের বুকেও ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। বোঝা যায় স্পষ্টই একই যন্ত্র পিঠ হতে বুকের একপাশ পর্যন্ত ফুঁড়ে গেছে। বোধ হয় লোকটাকে হত্যা করে, পরে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লোকটার বয়স ত্রিশ থেকে চৌত্রিশের মধ্যে হবে বলেই মনে হয়। গঙ্গার ধারে জেলেদের পাড়া। গঙ্গা থেকে ছোট একটা খাড়ী মত জেলেপাড়ার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেছে। খাড়ীটা মাইল দুই ঘুরে আবার পুবমুখো হয়ে গঙ্গায় এসে মিশেছে। খাড়ীর দু'পাশে কয়েকঘর জেলে ও চাষাভূষার বাস। দু'পাশে ধানের ক্ষেত। বড় সড়কটা পাশ দিয়েই চলে গেছে। খাড়ীর উপরে একটা হাত দশেক লম্বা কাঠের পুল।

খাড়ীর দু'পাশে ঘন আশ-শ্যাওড়া, কাঠ-যুঁই ও বনমল্লিকার জঙ্গল।

প্রায় প্রত্যেক জেলেরই মাছ ধরবার ডিঙি আছে।

জেলেরা প্রত্যহ সকালবেলা ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যায়।

সারাদিন গঙ্গায় জাল ফেলে যা মাছ ধরে, বিকালে শ্রীরামপুরের বাজারে তা বিক্রী করে আসে। জেলে পাড়ারই সর্দার রতন জেলের তরুণ যুবা পুত্র মদনা সেদিন শেষরাত্রে যখন মাছ ধরতে ডিঙি বেয়ে খাঁড়ীর ভিতর দিয়ে চলেছে, তখন হঠাৎ পুলটা থেকে কিছু দূরে মনসা ঝোপের কিনারে মৃতদেহটা আটকে আছে প্রথম দেখতে পায়। তখুনি সে বাড়ি ফিরে এসে তার বাপ রতন সর্দারকে সংবাদ দেয়। রতন সর্দার ছেলের সঙ্গে গিয়ে মৃতদেহটা ভাসছে দেখতে পায়। সে তার ছেলেকে দিয়ে তখুনি এক মাইল দূরবর্তী শ্রীরামপুর থানার দারোগাকে সংবাদ পাঠায়। দারোগা সামসুদ্দীন তখুনি সংবাদ পেয়ে লাল পাগড়ী সমভিব্যাহারে অকুস্থানে এসে হাজির হন। মৃতদেহ সেখান থেকে তুলে নৌকোয় করে থানায় নিয়ে আসেন। এবং ফোনে হুগলী পুলিস হেড্-কোয়ার্টারে খবর পাঠান। হুগলী থেকে গোয়েন্দা পূর্ণ চক্রবর্তীকে তদন্ত করবার জন্য বড় কর্তা পাঠিয়ে দেন।

এগার

পূর্ণ চক্রবর্তী যখন থানার সামনে এসে নিজের গাড়ি থেকে নামলেন, বেলা তখন প্রায় এগারটা। থানার একটি ঘরে মাটির উপরে মৃতদেহটা একটা ময়লা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সেই ঘরে তখন দারোগা সামসুদ্দীন ছাড়াও রতন সর্দার, তার ছেলে মদনা, পুলিস সার্জেন ডাঃ ওয়াহেদ ও একজন সুন্দর মত ঢেঙা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

ভদ্রলোক ইউ, পি-র একজন ডাক্তার নাম এনায়েৎ খাঁ। তিনি বাসে করে চন্দননগরে যাচ্ছিলেন এমন সময় অল্প দূরে লোকের ভিড় দেখে নেহাৎ কৌতূহলের বশেই বাস থেকে নেমে পড়েন। অকুস্থলে এসে ব্যাপার দেখে দারোগা সামসুদ্দিনের সঙ্গে দু'চার কথায় জানতে পারেন, সামসুদ্দিনেরাও দুই পুরুষ আগে ইউ. পি-তে ছিলেন। তারপর তিনিও দারোগা সাহেবের সঙ্গে থানায় এসে হাজির হয়েছেন। দারোগা সাহেব তাঁকে এখানেই চারটি খেয়ে দুপুরের বাসে আবার চন্দননগর যেতে বলেছেন। ডাক্তার এনায়েৎ খাঁও রাজী হয়েছেন। পূর্ণবাবু যখন এসে ঘরে ঢুকলেন, পুলিস সার্জেন ওয়াহেদ মৃতদেহটা পরীক্ষা করে সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

পূর্ণবাবুকে নিজের পরিচয় আর দিতে হলো না, কেননা সামসুদ্দীন সাহেব ও ডাক্তার ওয়াহেদের সঙ্গে তাঁর আগেই বিশেষ পরিচয় ছিল। পূর্ণবাবু কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা পুলিস সার্জেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিছু পেলেন ডাক্তার, মৃতদেহ পরীক্ষা করে?

এই লোকটাকে প্রথমে ছুরি মারে, পরে জলে ভাসিয়ে দেওযা হয়েছিল বলেই মনে হয়। ছুরি মারায় হয়ত অজ্ঞান হয়ে যায়, পরে জলে ডুবে মারা গেছে। যদিও ঐ আঘাতেই লোকটার মৃত্যু হতে পারত। ছুরির বা অস্ত্রের ফলাটা ডান দিককার ফুস্ ফুস্ ভেদ করে চলে গেছে। স্পনটেনিয়াস্ নিউমোথোরাক্স্ হয়েছিল। মনে হয় অস্ত্রের ফলাটা বেশ লম্বা এবং তীক্ষ্ণ ছিল।

কোন রহস্য সূত্র পেয়েছেন সামসুদ্দিন সাহেব? পূর্ণবাবু এবারে দারোগা সাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ মিঃ চক্রবর্তী!...মৃত দেহ যেখানটায় পাওয়া গেছে তারই ঠিক অল্প দূরে মনসা ঝোপের ধারে একটা সাদা পাঞ্জাবি ও একটা গান্ধী টুপি পাওয়া গেছে। ঐ পাঞ্জাবি ও টুপিতে রক্তের ছাপ রয়েছে, আরো একটা ব্যাপার জানা গিয়েছে গতকাল বিকেলের দিকে মদনা নাকি একজনকে খাঁড়ীর ধারে ঘুরতে দেখেছিল। তার গায়ে সাদা পাঞ্জাবি ও টুপি ছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম ঐ লোকটি শ্রীরামপুরেরই এক স্বর্ণকারের ছেলে, নাম সুশান্ত আঢ্যি! ছেলেটা ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল, তারপর অসৎ সঙ্গে মিশে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। বাপের অগাধ টাকা। তার ওপর বাপের একমাত্র পুত্র! এখন খালি আড্ডা দিয়ে গান গেয়ে বেড়ায়। সুশান্তর একটা ছোট ডিঙি আছে ; প্রায়ই ও সেই ডিঙিটায় চেপে গঙ্গায় ও খাঁড়ীর মুখে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। গতকাল ছাড়াও দিন দুই আগে সন্ধ্যাবেলা সুশান্তকে তার ডিঙির উপরে চেপে খাঁড়ীর মুখে দেখা গিয়েছিল। শ্রীমান কিছুদিন হলো মদ খেতেও শুরু করেছেন। ডিঙিটা জেলে পাড়াতেই থাকতো। বাড়ির ঘাটে নিয়ে যেতে বাপের ভয়ে সাহস পায় না। মদনা ছাড়াও সেদিন রাত্রি প্রায় দুটোর সময় সে নাকি যখন ডিঙিটা জেলে পাড়ায় ছেড়ে রেখে যায় তখন জেলে পাড়ার পতিত তাকে দেখতে পায়, সে মাছ ধরে রাতে ফিরছিল। পতিতের হাতে বাতি ছিল, সুশান্ত ওর সামনা-সামনি পড়ে যায়। ওকে দেখে সুশান্ত যেন হকচকিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি সরে পড়ে। সুশান্তকে পাশের ঘরে এনে বসিয়ে রেখেছি।...

পূর্ণবাবু বললেন, হুঁ।

এমন সময় এনায়েৎ খাঁ বললেন, মিঃ চক্রবর্তী, একটা জিনিস মৃতদেহে লক্ষ্য করেছেন কি? পিঠের উপরে লোকটার দুটো ক্ষতচিহ্ন, একটা উপরে, বেশ বড় ক্ষতচিহ্ন, দ্বিতীয়টা তারই নীচে যেন অনেকটা ছেঁচড়ে গেলে যেমন ক্ষত হয় তেমনি।

পুলিস সার্জেন বললেন, হ্যাঁ। আমার মনে হয় প্রথমটা, মানে বড় ক্ষতটা। এমন কোন লোকের দ্বারা হয়েছে, যার হাত steady ছিল না।

পূর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, যে অস্ত্রের সাহায্যে আপনাদের মনে হয় লোকটাকে হত্যা করা হয়েছে সেটা পাওয়া গেছে কি?

না, পুলিস সার্জেন বলতে লাগলেন, তবে ক্ষতচিহ্ন দেখে মনে হয়, যে অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে, সেটা লম্বা ও সূচাল...ধারাল মোটা ইস্পাতের ছোরা জাতীয় কিছু!...

এমনও তো হতে পারে কচ্ছপ শিকার করবার বল্লম দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, জেলেদের বাড়িতে যা প্রায় সবারই আছে! যাকে সাধারণত কোঁচ্ বলা হয় পূর্ণবাবু বললেন।

হঠাৎ এনায়েৎ খাঁ বললেন, মাপ করবেন মিঃ চক্রবর্তী!.. আচ্ছা পুলিস সার্জেন, আপনার মনে হয় কতক্ষণ দেহটা জলের মধ্যে ছিল?

বার থেকে চব্বিশ ঘণ্টার কম নয়। সার্জেন জবাব দিলে।

মিঃ চক্রবর্তী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতক্ষণে এনায়েৎ খাঁর দিকে তাকালেন, আপনি?

দারোগা সাহেব জবাব দিলেন, আমার এক বন্ধু ডাক্তার!...এনায়েৎ খাঁ নাম।

আচ্ছা লোকটার পরিচয় কিছু জানতে পেরেছেন দারোগা সাহেব? পূর্ণবাবু আবার প্রশ্ন করলেন।

না মিঃ চক্রবর্তী!...তবে জিজ্ঞাসাবাদ ও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আশেপাশে কেউ ওকে চেনেনা। বিদেশী বলেই মনে হয়। লোকটার পকেটে একটা বেনারস থেকে কলকাতা পর্যন্ত ইণ্টার ক্লাস টিকিট, একটা রেশমী রুমাল, একটা মনিব্যাগ, তাতে দশ টাকার খান পাঁচেক নোট, কিছু ভাঙানি, ব্যাগটার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। যাতে করে মনে হয় লোকটা গরীব সাধারণ নয়। আর একটা কথা এর মধ্যে আছে মিঃ চক্রবর্তী। মতি নাকি লোকটাকে দিন কয়েক আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা সুশান্তর ডিঙিতে দেখতে পেয়েছিল।

আমার মনে হয় দারোগা সাহেব মৃত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে, ডাঃ এনায়েৎ বললেন।

পূর্ণবাবু ইতিমধ্যে ডাঃ এনায়েতের বুদ্ধির পরিচয় তার দু'একটা কথা থেকেই পেয়েছিলেন। সহসা ঐ কথাটা শুনে তিনি চমকে ডাক্তারের দিকে

ফিরে তাকালেন।

আর এনায়েৎ ততক্ষণে মৃত ব্যক্তির জুতো থেকে দু'গাছি শুকনো খড়ের টুকরো টেনে বের করে খড় দুটোকে ত্রিকোণাকার করতে লাগলেন।

পূর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, লোকটার কি পরিচয় পেলেন বলুন তো? ডাক্তার, চিনতে পেরেছেন নাকি?

হাঁ...আপনার মনে আছে কিনা জানি না মিঃ চক্রবর্তী, মাস তিনেক আগে লাহোরের নবাব আমীর খাঁর হারানো হীরার ব্যাপারে বেনারসের বিখ্যাত ধনী জুয়েলার অনন্তরাম শেঠজী নিহত হন...

পূর্ণবাবু আমীর খাঁর হীরার ব্যাপারে সবই জানতেন, ডাক্তারের কথায় চমকে মুখ তুলে বললেন, বলেন কি! তাহলে কি আপনার ধারণা লোকটা শেঠজীরই বাড়ির কেউ?

আমার অন্ততঃ তাই মনে হয় মিঃ চক্রবর্তী। লোকটা শেঠজীরই ড্রাইভার বনোয়ারী লাল।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই যুগপৎ একসঙ্গে চম্‌কে ডাক্তার এনায়েতের মুখের দিকে তাকাল।

পূর্ণবাবু মুহূর্তকাল যেন চুপ করে থেকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তবে আপনিই কি সেই ডাঃ এনায়েৎ নাকি, যিনি সেদিন ঐ সময় শেঠজীর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন?

মৃদু কণ্ঠে ডাঃ এনায়েৎ বললেন 'হাঁ। মিঃ চক্রবর্তী আমিই সেই ডাক্তার এনায়েৎ।

আবার সব মুহূর্তের জন্য চুপচাপ।

এবারে দারোগা সাহেব বললেন, তাহলে তো দেখছি ব্যাপারটা সহজই হয়ে গেল। কারণ লোকটা সত্যি সত্যিই শেঠজীর ড্রাইভার বনোয়ারী কি না সেটাও আমরা একটু চেষ্টা করলে জানতে পারব বেনারস পুলিস ডিপার্টমেণ্টে একটা তার করলেই হবে বনোয়ারীর Particulars সম্পর্কে!

হাঁ তা হবে, যমুনাদেবী শেঠজীর মেয়ের দ্বারাই সেটা সম্ভব হবে। ডাঃ এনায়েৎ বলেন, তাছাড়া বনোয়ারী সম্পর্কে অনেক কিছু শেঠজীর মেয়ে

যমুনা দেবীকে প্রশ্ন করেও জানতে পারি, কথাটা বলে, একটু থেমে আবার বললেন, তার চাইতেও বড় কথা আগে আমাদের জানা দরকার, বনোয়ারী খুন হলো কেন? এবং কেই বা এই বিদেশে কিসের জন্য তাকে খুন করলে? ভাল কথা দারোগা সাহেব, একটু আগে না বলছিলেন, এই লোকটাকে দিন কয়েক আগে একদিন সন্ধ্যা বেলা সুশান্তর সঙ্গে সুশান্তর ডিঙিতে চেপে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল? কে দেখেছিল বলুন তো?

বার

দারোগা সাহেব জবাব দিলেন, রতন সর্দারের ছেলে মদনা বলছিল, কৃষক পাড়ার দীননাথ পালের ছেলে মধু তাকে দেখেছে এবং সেই কথাটা মদনাকে বলেছে দীনু পালের ছেলে মধু। তা কে ঐ দীনু জান। পল্লীতে দীনু পালের অবস্থাটাই সব চাইতে ভালো। দীনুর দুই ছেলে মধু আর যদু! বাড়ির ধারে প্রায় কুড়ি বিঘে জমি ওদের। শহরে একটা বড় মুদিখানার দোকানও আছে। তাতেও প্রচুর লাভ হয়। জমিতে আউষ ধান পেকেছে, দু'চার দিনের মধ্যেই কাটা হবে, যদু মধু তারই তদারক করতে জমিতে এসেছিল, সেই সময় সে দেখতে পায় সুশান্ত আর এই লোকটা নৌকো করে খাঁড়ীর মধ্যে বেঁয়ে চলেছে। কিন্তু মধুরও একটা ইতিহাস আছে। বিশেষ বড় একটা কারো সঙ্গে মিশে না। সকলের কাছ থেকে একটু দূরে দূরেই থাকে।

কেন? পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

মধু মাস দুই আগে পাঁচ মাস জেল খেটে এসেছে। মধু লোকটার স্বভাব খুব ভাল নয়। মধুর মকদ্দমার সময় জানতে পারলাম ও নাকি কলকাতার কতকগুলো গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকের সঙ্গে মেশামিশি করতো।...মধু ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্যন্ত শ্রীরামপুর স্কুলে পড়েছিল। খেলাধূলায় ও চমৎকার ছেলে ছিল। বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায় খুব ভালো 'বোলিং' করতে পারত, কিন্তু অসৎ সংগে মিশে পড়াশুনা আর হয় না। ওর বাপ ছেলেকে স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে এনে ব্যবসায় জুড়ে দিয়েছেল ; সেই থেকে বাপের ব্যবসায়ই ও দেখে। একটা ডিঙি আছে ওদের, মাঝে মাঝে ও নৌকো নিয়ে মাছ ধরেও বেড়ায়। তবে জেল খেটে আসবার পর থেকে বেশ শান্ত-শিষ্ট ভাবেই দিন কাটাচ্ছে। আগে আগে নানান দলে ঘুরে বেড়াত। এখন আর তা বেড়ায় না।

মধুর সঙ্গে এক বার আমি কথা বলতে চাই দারোগা সাহেব।

তাকেও ডাকতে পাঠিয়েছি।

বেশ, এবার চলুন শ্রীমান সুশান্তর সঙ্গে একবার দেখা করা যাক।

সকলে পাশের ঘরে এসে বসলেন।

একজন পুলিস গিয়ে সুশান্তকে সেই ঘরে ডেকে আনল।

সুশান্তর বয়স ২৪/২৫ বছরের মধ্যেই হবে।

রোগা লম্বাটে চেহারা।

গায়ের রঙ বেশ পরিষ্কার। একমাথা এলোমেলো ঝাঁক্ড়া চুল। চোখের কোণে কালো দাগ পড়ে গেছে, দেহের উপর অযথা অনিয়ম ও অত্যাচার যে পুরোমাত্রাতেই হচ্ছে তার স্পষ্ট ছাপ।

মুখখানা ভেঙে গেছে। গালের চোয়াল দুটো বেশ স্পষ্ট উঁচু হয়ে উঠেছে। পরিধানে পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে একজোড়া নতুন কাবুলী চপ্পল।

পূর্ণবাবুই প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিহে তোমার নাম সুশান্ত না?

আজ্ঞে—শ্রীসুশান্তকুমার আঢ্য!

এখানে থাক কোথায়?

শ্রীরামপুরে বাজারের কাছে।

শুনলাম যে লোকটির মৃতদেহ খাঁড়িতে পাওয়া গিয়েছে তাকে এবং এখন পাশের ঘরে রাখা আছে তাকে তুমি চিনতে?

আজ্ঞে সামান্য পরিচয় মানে কয়েক দিন হল আমাদের কলকাতার জুয়েলারীর দোকানে আলাপ হয়।

লোকটার কি নাম বলেছিল?

নাম বলছিল বনোয়ারী লাল।

কিন্তু আমি খবর পেয়েছি লোকটার সঙ্গে তুমি দিনকয়েক খুব মেলামেশা করেছিলে?

তা করেছি।

কেন বল তো।

এমনই—

না, মিথ্যা বলছো। সত্যি বল।

আজ্ঞে—

—সত্যি কথা সব খুলে বল।

আজ্ঞে ওর কাছে একটা হীরা আছে বলেছিল এবং সেটা সে ভাল রকম দাম পেলে বিক্রী করতে পারে। আমি বাবাকে হীরাটার কথা বলেছিলাম, কিন্তু তিনি কিনতে চাইলেন না, বললেন কোথাকার কোন চোরাই মাল হবে হয়ত, কিনে শেষে বিপদে পড়বেন। আমাকে লোকটা তখন অন্য কোন উপায়ে হীরাটা বেচে দিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করে। আমি শুনেছিলাম এখানকার মধু পালের সঙ্গে নাকি অনেকের জানাশুনা আছে, আমি তখন তাকে মধু পালের নাম করি। সে বলে মধু পালকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখতে যদি সে হীরাটা বেচবার কোন উপায় করে দিতে পারে। আমি একদিন মধু পালকে ডেকে সব কথা বলি।

তার পর, মধু তোমার কথা শুনে কী বললে?

মধুর সঙ্গে ঠিক হয় গত শনিবার তাকে নিয়ে এসে আমি এক মারোয়াড়ীর সঙ্গে পরিচয় করে দেবো, তারপর ওরা দু'জনে কথাবার্তা বলবে। কিন্তু শনিবার সকালে এক বন্ধুর সঙ্গে চন্দনগর চলে যাই এবং ফিরতে রাত্রি প্রায় এগারটা হয়ে যায়। বনোয়ারীর সঙ্গে কথা ছিল পুলের ধারে সে আসবে রাত্রি দশটায়, মধুও সেখানে আসবে তারপর সব কথাবার্তা হবে। কিন্তু এসে দেখলাম কেউ সেখানে নেই। বন্ধুর ওখানে বেশ খানিকটা মদ খেয়েছিলাম। মনটাও বেশ স্ফূর্তিতে ছিল। ভাবলাম নৌকোটা নিয়ে খানিকটা ঘুরে আসি। কতক্ষণ ঘুরেছিলাম জানি না, কখন যে নেশার ঝোঁকে আবার ফিরে এসে নৌকো ঘাটে রেখে হেঁটে বাড়ি চলে গেছি তাও আমার ঠিক মনে পড়ে না।

এমন সময় হঠাৎ ডাঃ এনায়েৎ এগিয়ে এসে সুশান্তর ডান হাতের পাতাটা তুলে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার হাত কাটল কি করে?

পূর্ণবাবু দেখলেন, সুশান্তর ডান হাতের পাতায় একটা প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চির পরিমাণ কাটার দাগ।

সুশান্ত মৃদু স্বরে জবাব দিল, ঠিক মনে করে বলতে পারছি না।

পূর্ণবাবু এবারে প্রশ্ন করলেন, বল কি, তোমার নিজের হাত কাটল, আর তুমি বলতে পার না কি করে কাটল?

না মনে নেই—

সহসা এমন সময় টেবিলের উপর থেকে রক্তমাখা খদ্দরের টুপিটা

সুশান্তর সামনে তুলে ধরে ডাঃ এনায়েৎ বললেন, চিনতে পার এ টুপিটা কার?

হুঁ! এটা আমার, সেদিন রাত্রে কখন বোধ হয় পড়ে গিয়েছিল।

এতে এত রক্ত এলো কোথা থেকে?

মনে পড়ছে না, কেননা সে রাত্রে তখন আমি নেশার ঘোরে ছিলাম।

পূর্ণবাবু তখন দারোগা সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, একে এখন হাজত ঘরে বন্ধ করে রাখুন। পরে চালাং দেবেন। এবারে চলুন দেখি একবার spot এ যাওয়া যাক্ যেখানে মৃতদেহটা পাওয়া গেছে।

সকলে তখন অকুস্থানের দিকে চলল।

থানা থেকে খাঁড়ী প্রায় এক মাইল পথ হবে। সকলে পূর্ণবাবুর গাড়িতে চেপেই পুলের মুখে এসে গাড়ী থেকে নামলেন।

অগ্রহায়ণের শেষ প্রায়। বেলা প্রায় সাড়ে বারটা হবে।

নির্মেঘ নীলাকাশ, প্রখর সূর্যতাপে যেন ঝল্‌সে যাচ্ছে। গঙ্গায় তখন ভাটার টান।

খাঁড়ীর জল অনেকটা নেমে গেছে, খাঁড়ীর দু'পাশে নরম গেরুয়া রংয়ের পলিমাটির পাড় দেখা দিয়েছে।

নরম পলিমাটির উপরে পা ফেলে ফেলে ওরা সকলে এগিয়ে চলে। খাঁড়ীর দুই পাড়ে ফণি মনসা, উলুবন ও খাগড়ার ঝোপ। মাঝে দু'চারটে কাশ গাছ। ধূসর বর্ণের কাশ ফুলের গুচ্ছ হাওয়ায় দুলছে। কাশগুচ্ছের গায়ে আল্‌তো ভাবে লাগা অভ্র কুচির মত কাশ ফুলের রেণু সূর্যের আলোয় যেন চিক্ চিক্ করছে।

পুল থেকে প্রায় হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে উলুখড় ও মনসার ঝোপের সামনে এসে দারোগা সাহেব দাঁড়ালেন এবং বললেন, এখানেই মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছে মিঃ চক্রবর্তী। এবং এর একটু অল্পদূরে ঐখানটায় ঝোপের মাঝে সুশান্তর টুপিটা পেয়েছি!...

মিঃ চক্রবর্তী এগিয়ে দেখলেন, সেখানে একটা সরু পায়ে চলা পথ খাঁড়ী থেকে বরাবর উঠে মাঠের মধ্যে চলে গেছে। মাঠের মধ্যে থেকে এ জায়গাটার কিছুই দেখা যায় না।

মিঃ চক্রবর্তী চারিদিকে একবার অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে

বললেন, চলুন এখানে আর কিছুই দেখবার নেই।

সকলেই ফিরবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

সহসা এমন সময় ডাঃ এনায়েৎ বললেন, কিন্তু আমার মনে হয় মিঃ চক্রবর্তী, এখানে এখনো অনেক কিছুই আমাদের ভাল করে পরীক্ষা কবে দেখবার আছে। একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না!...ঐ সামনে জলের মধ্যে একটা ঘূর্ণাবর্ত দেখতে পাচ্ছেন কী?

মিঃ চক্রবর্তী ডাঃ এনায়েতের কথায় অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন। যেন ব্যাপারটা আগাগোড়া কিছুই উনি বুঝতে পারেননি, বললেন, কি বলছেন ডাক্তার?

বলছিলাম ওই ঘূর্ণাবর্তের কথা!

ডাঃ এনায়েৎ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়ে সকলেই জলের দিকে তাকালেন। ভাটার টানে খাড়ীর ঘোলাটে জল বিপরীত মুখে ছুটে চলেছে। যেখানে ওঁরা সকলে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখান থেকে প্রায় হাত দুই দূরে জলের বুকে একটা ছোট ঘূর্ণাবর্ত...জলের স্রোত সেখানে এসে ক্রমাগত পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে।

সকলে বিস্ময়ে ঘূর্ণাবর্তটার দিকে চেয়ে রইলো, কারও মুখেই কোন কথা নেই! কেউই যেন বুঝে উঠতে পারছেন না, জলের মধ্যে সামান্য একটা ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে এমন কী আশ্চর্য রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে।

জলের বুকে এমন ঘূর্ণাবর্ত তো হামেসাই দেখা যায়। এতে আশ্চর্য হবারও তো কিছু নেই। লোকটা কী পাগল নাকি?

ডাঃ এনায়েৎ আবার বললেন, ইউ. পি-তে আমার এক বন্ধু ছিলেন। সখের গোয়েন্দাগিরি করাই ছিল তাঁর হবি! অনেক কঠিন কঠিন কেসে, পুলিস যেখানে হাল ছেড়ে দিয়েছে, তিনি তার অপূর্ব বুদ্ধি চাতুর্যে ও সূক্ষ্ম বিচাব শক্তির দ্বারা সে সবের রহস্য ভেদ করে দিয়েছেন। তাঁকে অনেক সময় বলতে শুনেছি, আমাদের দৃষ্টিশক্তির অভাবে অনেক সময় অনেক মূল্যবান সূত্র আমরা হারিয়ে ফেলি। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে ঐ সব সামান্য ছোট ছোট ব্যাপার থেকে অনেক সময আমরা বড বড় রহস্যের কিনারা করতে পারি। সব সময় খুব ভাল করে চোখ চেয়ে সব কিছু বিচাব করে দেখা উচিত। কোথায় কোন সামান্যতম সূত্র হতে যে

কত গভীরতম রহস্যের কিনারা হয়ে যায় কেউ কি তা বলতে পারে! যাক্। ভাল কথা—আচ্ছা এই খাঁড়ীর জলের গভীরতা এখানে কত হবে?

দারোগা সাহেব বললেন কত আর খুব সামান্যই, বড় জোর হাত দেড়েক কি হাত দুই তার বেশী নিশ্চয়ই না।

বেশ, তাই যদি হয়, চেয়ে দেখুন আশেপাশে যত দূর দৃষ্টি যায় কোথাও ঘূর্ণাবর্ত আর দেখতে পাচ্ছেন কি? কোথাও কোন ঘূর্ণাবর্ত নেই, অথচ ঐখানটাই বা কেন আছে! আরো একটা কথা, এখানেই মৃতদেহটা পাওয়া গেছে! এখানে জল তেমন বেশী নেই, দেখাই যাক্ না ব্যাপারটা কী?... বলতে বলতে তিনি জুতো খুলে জলে নেমে গেলেন।

প্রায় এক হাঁটু জল সেখানে। মুহূর্তের মধ্যে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে কাঠের একটা ভাঙা হাতখানেক পরিমাণ হাতল সমেত, ধারালো চক্চকে বর্শার ফলা তুলে আনলেন। বর্শার ফলাটা হাতে করে পাড়ে উঠে এলেন। সকলে সবিস্ময়ে ডাক্তারের হস্তধৃত ধারালো চকচকে বর্শাফলকটার দিকে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার বললেন, কেমন দেখলেন...এখন জলের দিকে চেয়ে দেখুন দেখি আর কোন ঘূর্ণাবর্ত দেখতে পান কিনা? এবারে এইটা পরীক্ষা করে দেখুন ; এর চকচকে ফলাটা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় না কি, বেশী দিন এটা জলে ছিল না। চেয়ে দেখুন এটার দিকে ভাল করে, সামান্য দু'এক জায়গায় মরচে ধরতে সবে শুরু করেছিল। আরো কিছুদিন এমনি জলে থাকলে হয়ত আরো বেশী মরচে ধরত। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে কোথা থেকে এটা এখানে এল? কেন এলো? আপনারা একটু আগে মৃত ব্যক্তির ক্ষতস্থান দেখে এই ধরণেরই কোন অস্ত্রের কথা বলছিলেন না? এই বর্শার আকৃতি দেখে মৃতব্যক্তির ক্ষতস্থানেব আকৃতির সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনা করে দেখলে মনে সন্দেহ হয় নাকি যে, এই অস্ত্রটার সঙ্গে খুনেরও কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?

দারোগা সাহেব এতক্ষণে বললেন, হাঁ মিথ্যা নয়, কিন্তু এ তো দেখছি কাছিম শিকার করার বর্শা সাধারণত যা পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তবেই দেখুন, এইটা থেকে আমরা অনেক কিছু ভাবতে পারি। এটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এটা তিন চার দিনের বেশী জলে ছিল না।

আশেপাশে সব চাষা ও জেলেদের বাড়ি। তারা এ জিনিসটার সঙ্গে বেশ পরিচিত। এখন খোঁজ করে দেখা যাক না, আশেপাশে এই বর্শাটা সম্পর্কে কেউ কিছু জানে কিনা?

ঠিক বলেছেন ডাক্তার, হর্ষোৎফুল্লভাবে মিঃ চক্রবর্তী বলে উঠলেন চমৎকার! আমার মনে হচ্ছে এখন নিশ্চয়ই এ খুনের কিনারা আমরা করতে পারব!

ওরা সকলে আবার পুলের দিকে রওনা হলেন। পুলের কাছাকাছি আসতেই ওঁরা দেখলেন, মাঠের দিক থেকে একজন কনেস্টবলের সঙ্গে মধু এই দিকেই আসছে, কেননা থানায় যেতে এই রাস্তাটাই পড়ে।

দারোগা সাহেবই প্রথম মধুকে দেখতে পেলেন এবং বললেন যে মধু পাল আসছে। তারপর চিৎকার করে ডাকলেন, রামশরণ এদিকে এস!

একটু পরেই কনেস্টবলের সঙ্গে মধু পাল ওদের সামনে এসে দাঁড়াল! মধু পালের বয়স ২৯/৩০এর মধ্যে। বেঁটে খাটো বলিষ্ঠ গঠন। গায়ের প্রত্যেকটি মাংস-পেশী যেন প্রচুর শক্তির ইঙ্গিতে সজাগ হয়ে আছে। মাথার বাবরী কাটা চুলগুলি তেল চপ্‌চপে কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ান। বেশভূষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মধু এসে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলো হাত যোড় করে, আমাকে ডেকেছেন দারোগা সাহেব?

হাঁ মধু, এদিককার ব্যাপার নিশ্চয়ই সব শুনেছো। তাই কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, দারোগা সাহেব বললেন।

হাঁ সাহেব, রামশরণের মুখে সবই শুনলাম।

মদনা বলছিল তুমি নাকি ঐ লোকটাকে, মানে যে খুন হয়েছে তাকে কয়েক দিন আগে সন্ধ্যার সময় সুশান্তর ডিঙিতে চেপে বেড়াতে দেখেছিলে?

হাঁ দেখেছিলাম বটে!...

আর একটা কথা। সুশান্ত বলছিল সে নাকি তোমার কাছে গিয়েছিল সেই লোকটা একটা হীরা বিক্রী করতে চায়, তার কোন ব্যবস্থা করতে পার কিনা তার খোঁজ নিতে!

হাঁ সুশান্ত এসেছিল বটে। আমি বলেছিলাম আমি কি আর জহরতের ব্যবসা করি যে তাকে হীরাটা বেচবার ব্যবস্থা করে দেব?

বটে! কিন্তু সে যে বলল তুমি তাকে আশ্বাস দিয়েছিলে হীরাটা বেচবার ব্যবস্থা করে দেবে, এবং গত শনিবার রাত্রি আটটার সময় পুলের ধারে দেখা করতেও বলেছিলে।

সাহেব, সে যে সত্যি কথা বলেনি তার প্রমাণ আপনি মাহেশের গদাই পালের ওখানে লোক পাঠালেই জানতে পারবেন। শনিবার দুপুরে আমি সেখানে যাই, ফিরি পরদিন সকালে, রাতে ওখানেই গান বাজনা আমোদ আহ্লাদ হয়েছিল, ওখানেই রাত্রি কাটিয়েছিলাম। জানি না সুশান্ত এতবড় শত্রুতা কেন-আমার সঙ্গে করেছে।...তার তো জ্ঞানত কোন ক্ষতিই আমি করিনি।

দারোগা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, সে আমি আগেই জানতাম মিঃ চক্রবর্তী...একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা জলের মতই পরিষ্কার হয়ে যায় না কি! আজ সোমবার। সোমবার বনোয়ারীর মৃতদেহ খাঁড়ীর জলে পাওয়া গেছে। শনিবারে সুশান্তকে রাত্রি দুটোর সময় পতিত জেলে ডিঙি খাঁড়ীর পাড়ে বেঁধে রেখে ডাঙায় উঠতে দেখে, সে সময় তার হাতে কাপড়ে রক্ত ছিল। এবং সে নিজেও স্বীকার করেছে যে ঐদিন রাত্রে বনোয়ারীর সঙ্গে দেখা করবার তার কথা ছিল। তারপর মৃতদেহের ঠিক কাছেই তার মাথার রক্তাক্ত টুপিটা পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই ও বনোয়ারীকে কাছিম শিকারের বর্শা দিয়ে খুন করে, মৃতদেহটা জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এখন মাতলামির ভান করে বলছে ও কিছুই জানে না। আমি বলছি আপনাকে সুশান্তই বনোয়ারীকে খুন করেছে। সেই খুনী। চলুন এখুনি তাকে চালান করে দিই গে!

ডাঃ এনায়েৎ এতক্ষণ চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে দারোগা সাহেবের কথা শুনছিলেন, এবারে মৃদু হেসে বললেন, উত্তেজনার মুখে ভাল করে সব দিক বিবেচনা না করে যদি সুশান্তকে খুনী সাজিয়ে চালান দেন, তবে তার চাইতে বড় অন্যায় বোধ হয় আর কিছু হবে না।

রাগত স্বরে দারোগা সাহেব ডাঃ এনায়েতের মুখের দিকে তাকালেন, What do you mean?

ডাঃ এনায়েৎ হাসতে হাসতে বললেন, Simply common sense, রাগ করবেন না দারোগা সাহেব। আপনারা পুলিসের লোক। ক্ষমতা

আপনাদের অনেকখানিই। কিন্তু সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন না! এমনি করে যে কত নিরপরাধী ব্যক্তি বিচার প্রহসনের গোলকধাঁধায় পর্যুদস্ত হয় তার ঠিকানা নাই! আমি বলছি সুশান্ত খুনী নয়! আমি তার প্রমাণ করবো!.

প্রমাণ করবেন?

হাঁ! বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কি টেনে বের করলেন, এই যে দেখছেন আমার হাতে একগাছি খড়!...এটা মৃত ব্যক্তির জুতোর সঙ্গে আটকে ছিল, আমি খুলে নিয়েছিলাম। মাত্র দুটি কারণে সুশান্ত খুনী নয় প্রমাণ হয়ে যায়। ১নং এই খড়টি ও এর মধ্যে বন্দী একটি জীবন্ত পিঁপড়ে। আর ২নং একটা জিনিস আপনারা আদপে ভেবেই দেখেন নি, সেটা হচ্ছে পুলিস সার্জেনের মতে, মৃতদেহ অন্ততঃ দু'দিন জলে ছিল। যেখানে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সে অতি প্রকাশ্য জায়গা। সেখান দিয়ে প্রত্যহ জেলেরা মাছ ধরতে যায় ও ফিরে আসে। আপনাদের ধারণা অনুযায়ী যদ্যি সত্যি সত্যিই বনোয়ারী শনিবার রাত্রেই সুশান্তর দ্বারাই খুন হয়ে থাকে তবে মৃতদেহটা ওখানে থাকলে কারও কী চোখে পড়ত না? দু'দিন ধরে? হয়ত এর জবাবে বলবেন মৃতদেহটা গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে পরে খাঁড়ীতে ভেসে এসেছে জোয়ারের সময়। কিন্তু সবার চাইতে উল্লেখযোগ্য যে খুন করেছে সে কি এতই বোকা যে মৃতদেহটা মাঝ গঙ্গায় না ভাসিয়ে দিয়ে খাঁড়ীর মুখেই ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর আসুন এই খড়টি ও এর ভিতরে বন্দী পিঁপড়েটিকে।...এই দেখুন এখনও পিঁপড়েটা বেঁচে আছে!...বলতে বলতে ডাঃ এনায়েৎ খড়ের টুকরোটি জোড়ার অংশ খুলে দিতেই একটি ছোট লাল পিঁপড়ে বের হয়ে এল!

ডাঃ আবার বলতে লাগলেন, আপনাদের সার্জেনের সঙ্গে আমি মত মিলাতে পারলাম না দারোগা সাহেব। প্রথমতঃ সার্জেন এখনো মৃতদেহের ময়না তদন্তই করেননি ; উপরে উপরে পরীক্ষা করেই বলেছেন, লোকটাকে আগে ছুরি মেরে জখম করা হয়েছে তারপর জলে ফেলে দেওয়ায় জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছে। জলে ডুবেই যদি তার মৃত্যু হয়ে থাকে তবে ময়না তদন্তের ফলে তার ফুসফুসে নিশ্চয়ই জল ও মাটি

পাওয়া যাবে। কিন্তু যাক্ সে কথা! এ ক্ষেত্রে সবার চাইতে উল্লেখযোগ্য ও বড় প্রমাণ ঘরের মধ্যে এই পিঁপড়েটি। লোকটা যদি দু'দিন জলেই থেকে থাকে তবে এই পিঁপড়েটা ৪৮ ঘণ্টা জলের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না। তারপর আর একটা কথা লোকটার জুতোর শুকতলায় এমন ভাবে এই লম্বা খড়টা এঁটে গেল কোথা থেকে?

তার পকেটের বাসের টিকিট থেকে প্রমাণ হয় সে শ্রীরামপুর থেকেই আসছিল, এবং সুশান্তর কথায় প্রমাণ হয় তার সঙ্গে কথা ছিল পুলের ধারেই দেখা হবে ওদের সঙ্গে। আপনাদের কথা ধরে নিয়েই যদি বলি যে সুশান্ত আগাগোড়াটাই সব মিছে কথা বলছে, বনোয়ারীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তারপর সুশান্ত নৌকো করে নিয়ে গিয়ে খুন করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে এসেছে। তাহলে ওর জুতোর সঙ্গে এতবড় খড়টা আটকে গেল কোথা থেকে? নৌকোর ভিতরেই কী খড় ছিল? আর থাকলেও সে নিশ্চয়ই বসেই ছিল? নৌকোর মধ্যে দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি করেনি যাতে করে এমনি ভাবে খড়টা জুতোর সঙ্গে আটকে যেতে পারে। আরো একটা কথা ; যেখানে মৃতদেহটা পাওয়া গেছে, সেখানে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পেতেন খড়ের কোথাও নাম গন্ধ পর্যন্ত নেই! এই সব প্রমাণ হতেই আমরা অনায়াসেই ধারণা করতে পারি যে মৃতদেহ দু'দিন জলে ছিল না। এবং সুশান্তই যদি শনিবার রাত্রে লোকটাকে খুন করে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সে মৃতদেহটা দুদিন ধরে কোথাও লুকিয়ে রেখে আবার এসে জলে ভাসিয়ে দিয়ে যায়নি।

তাকে বাধা দিয়ে ডাঃ আবার বললেন, জানি, আপনারা হয়ত প্রশ্ন করবেন এখুনি সুশান্তর কাপড়ে জামায় ও টুপিতে রক্ত এলো কোথা থেকে!...তার স্বপক্ষে আমি বলব, সুশান্তর হাত কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছিল, এবং সেই রক্তই ওর জামায় লাগে ও টুপিতে লাগে। নেশার ঘোরে ও ছিল টের পায়নি। সুশান্তর হাতের কাটাটা লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পারতেন, সেটা কোন ধারালো কিছুতে হঠাৎ ঘসা লেগে কেটে গেছে! আমার মনে হয় ও হয়ত নেশার ঝোঁকে ডিঙি বাইতে বাইতে মনসা কাঁটার ছোপের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তারপর সেখান থেকে নৌকো বের করতে গিয়ে কাঁটায় হাত কেটে যায় এবং সম্ভবত

হয়ত টুপিটাও সেই সময় কাঁটা গাছে আটকে যায় ; টুপিটা ও ছাড়াতে যায় কিন্তু নেশার ঘোরে হয়ত পারেনি। তারপর হয়ত সামান্য একটা টুপির জন্য ও তেমন কিছু ভাবেনি বা কেয়ার করেনি। অবিশ্যি যা বললাম বা যে যুক্তি তর্কের কথা আমি বললাম, সব কিছুরই ভিত্তি আমার অনুমানের উপরে এবং যে সব clue পেয়েছি তার উপরে নির্ভর করে বলছি। যাক যা বলছিলাম। এখানে আমাদের আর একটি কথাও চিন্তা করতে হবে। সব কিছু বিচার বিবেচনা করে মনে হচ্ছে যেন খুনী আগাগোড়াই সুশান্তর উপর লক্ষ্য রেখেছিল, এবং প্রথম থেকেই ওর সংকল্প ছিল মনে হয় সুশান্তর ঘাড়েই ও খুনের দায়টা চাপিয়ে সরে দাঁড়াবে।

খুনী হয়ত ঘটনার সময় আশেপাশে কোথাও থেকে সুশান্তকে লক্ষ্য করছিল, এবং সুশান্তর রক্তমাখা টুপিটা দেখে সেটাও তুলে নেয়। এবং সময় বুঝে মৃতদেহটা সেখানে দিয়ে টুপিটা গাছের সঙ্গে পাশেই আটকে রেখে যায় যাতে পরে সব দোষটা ভালভাবেই ওর ঘাড়ে পড়ে কিন্তু খুনী হিসাবে দুটো ভুল করে।...এক নম্বর হচ্ছে লোকটাকে খুন করবার পরই মাঝগঙ্গায় গিয়ে জলে না ভাসিয়ে দিয়ে পরে খাঁড়ীর মুখে ভাসিয়ে দিয়ে। আর দুই নম্বর সুশান্তের উপর খুনের দায়টা চাপাবার চেষ্টা করে। এমনই হয় এমনি করে যারা দোষী তারা নিজের অজ্ঞাতেই দোষের সূত্র পিছনে রেখে যায়। মৃত্যু তার পথরেখার মধ্য দিয়েই জানিয়ে দেয় কেমন করে কোন পথ ধরে সে এল! তাই বলছিলাম সুশান্ত খুনী নয়।

সুশান্ত খুনী নয়?

না।

—তবে কে হত্যাকারী?

খুনী আপনার সামনেই উপস্থিত এই মধুপাল। ওকে গ্রেপ্তার করুন।

সকলে বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে গেছেন কিন্তু বিচক্ষণ মিঃ চক্রবর্তীর আদেশে তখুনি দুইজন কনেস্টেবল দু'পাশ থেকে মধুর দু'খানা হাত শক্ত করে চেপে ধরল।

মধু ফ্যাল ফ্যাল করে ডাঃ এনায়েতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তের

ডাঃ এনায়েৎ তখনো বলতে লাগলেন, উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে। মধুই যে খুনী কেন সেই কথাই এবার আমি বলবো। মধুর দুটি ভুলের কথা আগেই আপনাদের বলেছি। এবারে তার তৃতীয় বা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুলের কথাই বলি যার সাহায্যে ওই দোষী বলে প্রমাণিত হতে পারে। সেই রাত্রে হয়ত ও বনোয়ারীকে ভুলিয়েভালিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে যায়। মাঠে এখন আউষ ধান পেকেছে। ধান কাটা চলছে। মাঠের মধ্যে ও বনোয়ারীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে, বনোয়ারীর সঙ্গে সব কথাবার্তা বলে। এবং কথাবার্তা বলে যখন ও বুঝতে পারে সত্যিসত্যি বনোয়ারীর কাছে কোন মূল্যবান হীরা আছে, তখনই ও বনোয়ারীকে খুন করতে সিদ্ধান্ত করে। তারপর বনোয়ারীর সঙ্গে বেচাকেনার দরদস্তুর ঠিক করে, এবং পরদিন তাকে আবার রাত্রে কোন এক সময়ে মাঠের মধ্যে দেখা করতে বলে। অতঃপর সোজা সে মাহেশে তার বন্ধুর ওখানে চলে যায়। সেখানে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মতলব করে আবাব সেই রাত্রেই এখানে ফিরে এসে সুশান্তর জন্য অপেক্ষা করে। ভাগ্যক্রমে যখন ও সুশান্তর রক্তমাখা টুপিটা কুড়িয়ে পায় ও চট্‌পট্‌ মনে মনে মতলব এঁটে ফেলে এবং পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে মাঠের মধ্যে যখন বনোয়ারী এসে অপেক্ষা করছে, তখন দূর থেকে বর্শা বিঁধে বনোয়ারীকে জখম করে তারপর মৃতদেহটা টেনে নিয়ে যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে যায়, বনোয়ারীর জুতোয় খড় আটকে যায়। এককালে মধুর বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে এবং বর্ষা দিয়ে কাছিম শিকার করার ব্যাপারে সে খুব দক্ষ ছিল, কাজেই বর্শার সাহায্যে সে সহজেই হত্যা করেছিল বনোয়ারীকে। অতঃপর মৃতদেহটা খাঁড়ীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে ও বর্শাটা ভেঙে জলে ফেলে দেয়!...বলতে বলতে এতক্ষণে ডাঃ এনায়েৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মধুর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ কি মধু যা যা আমি বললাম প্রায় সবই ঠিক তাই না? আর এই বর্শাটা। তোমার কাছিম শিকার ও মাছ ধরবার সখ আছে, নিশ্চয় তোমারই!

মধু হঠাৎ ঐ সময় ধীর শান্ত স্বরে বললে, হাঁ, আমিই বনোয়ারীকে খুন করেছি।

দিলীর খাঁ এই পর্যন্ত বলে চুপ করলেন।

সামনে টেবিলে রক্ষিত ঘড়িতে দেখা গেল রাত্রি প্রায় সোয়া বারোটা বাজে!

সুন্দর সিং চঞ্চল হয়ে উঠলেন, উঃ অনেক রাত্রি হয়ে গেল, মিঃ ঘোষাল আপনি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন এবার বাড়ি ফিরে যান। এখনো খাঁ সাহেবের বলা শেষ হয়নি। আমি সবটা শুনে তবে উঠবো। আর একদিন গিয়ে না হয় আপনার বাসায় খেয়ে আসা যাবে!

মিঃ ঘোষাল প্রবল আপত্তির সুরে বললেন, আমিও উঠছি নে গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত! নাইবা হলো আজ খাওয়া! খাওয়া তো রোজই আছে। কিন্তু এ কাহিনী, মনে হচ্ছে যেন বিশেষ করে আজকের কোন এক বিশেষ রাতের জন্যই তৈরী হয়েছে। তাছাড়া আজ রাত্রে আপনি আমার গৃহে নিমন্ত্রিত, আপনাকে ফেলে তো আমার খাওয়া হতে পারে না।

সুন্দর সিং বাধা দিলেন, না না বাড়ির সবাই হয়ত ভাববেন। মিঃ ঘোষাল তখন দিলীর খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, খাঁ সাহেব, আমার বাড়িতে একটা চিঠি দিলে আপনার কোন একজন লোককে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন না?

দিলীর খাঁ হেসে বললেন, কেন পারব না। কিন্তু কি এমন আছে অভিশপ্ত হীরার কাহিনীতে? আমি শুধু মিঃ সিংকে আজ এখানে ডেকে এনেছি একটা কথা বলতে যে অন্যায় ভাবে, বিচারের প্রহসন করে কত নিরীহ লোককেই না ফাঁসীর মঞ্চে পাঠানো হয়। এই যেমন ধরুন রূপলাল, কাল হতভাগ্যের ফাঁসী অথচ যে অপরাধের জন্য ফাঁসী হচ্ছে আসলে তার জন্য মোটেই তাকে দোষী করা যায় না শুধু নিয়তির টানে সে এই খুনের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়েছে। যে লোভে সে খুন করলে, সে হীরা তার নাগালের বহু দূরেই আজও রয়ে গেল! মরীচিকার পিছু পিছু ছুটতে গিয়েই হতভাগ্য তার প্রাণ দিতে চলেছে। এর জন্য দায়ী

কে? কারা? আমাদের সমাজ না অবস্থার বৈষম্য, আর যারা বিচারের আসনে বসে বিচারের প্রহসন চালাচ্ছেন তাঁরাই বা কি বিচার করছেন!...কিন্তু সেকথা থাক। আমার কাহিনী এখনও শেষ হয়নি। আপনাদের যখন এতই শুনবার স্পৃহা, তখন নিরাশ নাইবা হলেন। দিন আপনি চিঠি লিখে, এখুনি আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মিঃ ঘোষাল তখুনি একটা কাগজে দু'কলম লিখে দিয়ে তার পরে ঠিকানা লিখে দিলেন।

দিলীর খাঁ বাইরে গিয়ে একজন ভৃত্যর হাতে দিয়ে চিঠিটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে এলেন।

ঘরে আবার প্রবেশ করতে করতে বললেন, কিছু স্যাণ্ডউইচ্ ও চায়ের কথা বলে এলাম। আমি অবিশ্যি রাত্রে কিছুই খাই না। কিন্তু আপনারা আজ আমার অতিথি, গৃহিণীহীন গৃহীর ঘরে এসেছেন বলেই যে সারাটা রাত একেবারে উপোস করে থাকবেন সেও তো হয় না। বলে তিনি আবার নিজের আসনে উপবেশন করলেন।

কিছুক্ষণ পর সুন্দর সিং হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, একটা কথা খাঁ সাহেব আপনি একটু আগে শেঠজীর খুনের ইতিহাস বিবৃত করবার সময় বলেছিলেন, বনোয়ারী লাল হীরাটা চুরি করেনি।

তখন কেন শুধু, এখনো বলছি বনোয়ারী হীরাটা চুরি করেনি। দিলীর খাঁ বললেন।

তবে বনোয়ারীর কাছে হীরাটা এল কি করে?

বলছি, হীরাটা চুরি করেছিল শেঠজীর মেয়ে যমুনা! প্রীতম সিংয়ের (?) মৃত্যুর পর এবং আনোয়ার ধরা পড়লে পুলিসে হীরার কথা প্রথম আনোয়ারের মুখে জানতে পারে এবং দু'দিন পরে হীরাটার খোঁজে এসে শেঠজীর বাড়িতে কি ঘটেছিল তা আপনাদের আগেই বলেছি। মধুর বিচারের সময় সাক্ষী দিতে এসে যমুনাই সে কথা কোর্টে দাঁড়িয়ে স্বীকার করে যায়।

মিঃ ঘোষাল এবারে বললেন, তাহলে মধুকে যখন ধরা হলো তাকে সার্চ করেই হীরাটা পাওয়া গিয়েছিল?

দিলীর খাঁ মাথা হেলিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললেন, না পাওয়া যায়নি, কেন না,

মধুকে সার্চ করবার মত অবকাশই পুলিস মোটে পায়নি। দু'জনেই একসঙ্গে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তার মানে?

তার মানে বলতে হলে আমাকে এর পরের ঘটনায় আসতে হয়।

এমন সময় ভৃত্য ট্রেতে গরম ধূমায়িত তিন কাপ কফি ও প্লেটে করে কিছু টোমাটো ও চীজ স্যাণ্ডউইচ সাজিয়ে নিয়ে এল।

দিলীর খাঁ বললেন, আসুন সকলে মিলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

গভীর রাত্রি।

নিঃশব্দতায় যেন চারিদিক থম্‌থম্‌ করছে।

নিদ্রিত শব্দহীন ধরণীর বুকে শব্দের একটানা ঢেউ জাগিয়ে চলেছে, সামনেই পাশের টেবিলের উপরে রক্ষিত টাইমপিসটা।

দিলীর খাঁ আবার তার আমীর খাঁর অভিশপ্ত হীরার রক্তঝরা কাহিনী শুরু করলেন ঃ গ্রেপ্তারের পর মধুকে দু'জন পুলিস দু'দিক থেকে শক্ত করে হাত ধরে থানার দিকে নিয়ে চলল। খাঁড়ীর ধার দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলে গঙ্গার ধার দিয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ ছিল। সে পথ দিয়ে গেলে অল্প সময়ের মধ্যে থানায় গিয়ে পৌঁছান যেত বলে সকলে সেই পথই বেছে নিলেন। গঙ্গার ধার দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একসময় মধু দারোগাবাবুকে অনুরোধ জানাল, একটা সিগ্রেট খেতে পারি দারোগা সাহেব?

দারোগা সাহেব খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, বললেন, নে বেটা খেয়ে নে। বলে আবার তিনি চলতে শুরু করলেন।

সিগারেট খাওয়ার ভান করে দিয়াশলাই জ্বেলে সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে সহসা ও ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ডানদিকের কনস্টেবলটির নাকে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসালে এবং দ্বিতীয়জন সতর্ক হবার আগেই তার পেটে বসালে এক লাথি। দু'জনে দু'দিকে ছিটকে পড়ল, আর চক্ষের নিমেষে একছুটে গিয়ে মধু গঙ্গার জলে লাফিয়ে পড়ে ডুব দিল।

লোকজন এল, পুলিস গঙ্গার জল তোলপাড় করে ফেললে, কিন্তু মধুর আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

বলেন কি!

হাঁ, একটু থেমে আবার দিলীর খাঁ বলতে শুরু করলেন ঃ কিন্তু সত্যিই কি মধু গঙ্গার জলে ডুবে মরল? না! সে বরাবর ডুব সাঁতার কেটে একেবারে উল্টো পথে খাঁড়ীর মুখে গিয়ে পাড়ে উঠল। নিঃশব্দে মনসা ঝোপের ভিতর দিয়ে এগুতে গিয়ে সর্বাঙ্গে তার কাঁটায় কেটে হিঁচড়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল, কিন্তু সেদিন তার এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে তখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ২ন একবুক সমান মনসা ও কাঠযুঁইয়ের ঘন ঝোপের মধ্যে কোনমতে সেঁধিয়ে ও মরার মত সেখানে পড়ে রইলো। পুলিসের লোক সারাটা দুপুর সন্ধ্যা পর্যন্ত খাঁড়ির আশপাশ গঙ্গার ধার খুঁজে খুঁজে সর্বত্র হয়রাণ হয়ে গেল।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। সূর্য গঙ্গার জল লাল করে অস্তে গেল। একটু একটু করে সন্ধ্যার অস্পষ্ট ধূসর ছায়া সমগ্র বিশ্ব চরাচরের উপরে যেন একটা পর্দা বিছিয়ে দিল।

রাত্রির অন্ধকার এলো ঘনিয়ে। একটি দুটি করে রাত্রির আকাশে তারাগুলো ফুটে উঠ্‌লো!

এবারে মধু ধীরে ধীরে মনসার ঝোপ থেকে মাথা তুললে।

গঙ্গার বুকে তখন জোয়ার এসেছে। জোয়ারের জল স্ফীত হয়ে কলকল ছলছল করে এসে মনসা ঝোপের ধারে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে পড়ছে। ও দেখলে অস্পষ্ট মৃদু তারার আলোয়, খান পাঁচ সাত বড় বড় খড় বোঝাই ও কাঠ বোঝাই নৌকো ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় টেনে টেনে বহে চলেছে মাঝগঙ্গা দিয়ে।

সারাটা দুপুর ও বিকাল ও কাঁটা ঝোপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে ভেবেছে, কেমন করে কোন পথে ও পালাবে। এ জায়গায় আর একটি মুহূর্ত থাকাও নিরাপদ নয়। পুলিস ওর বাড়ির চার পাশে ঘুরছে। একমাত্র উপায় কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া। সাধারণ রাস্তা দিয়ে গেলে সহজেই পুলিসের লোক তাকে ধরে ফেলবে। পালাতে হলে একমাত্র পথ হচ্ছে গঙ্গা দিয়ে। এখন অস্পষ্ট আলো-আঁধারে ওই নৌকোগুলিকে এদিকে আসতে দেখে ও তখুনি মনে মনে একটা মতলব ঠিক করে ফেললে। এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা ঝোপ হতে সন্তর্পণে বের হয়ে জলে গিয়ে নামল। জলে নেমে ও

সাঁতরাতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ও একটা খড় বোঝাই বড় নৌকোর সামনে এসে পড়ল। খড়গুলো জলের বুকে ঝুলে পড়েছে। স্রোতের জল খড়ের গায়ে লেগে সর্ সর্ করে শব্দ করছে। নৌকোর চারপাশে অন্ধকার জলের বুকে সাঁতরে সাঁতরে ও দেখতে লাগল কী ভাবে কোন পথে নৌকার উপরে উঠতে পারে। একটা বড় মোটা কাছি এক পাশে পায়খানা যাবার কাঠের পাটাতনটার সঙ্গে ঝুলছিল, সেইটাই কোনমতে আঁকড়ে ধরে ও দড়ি বেয়ে নৌকোর এক পাশে উঠে পড়ল। তারপর সেই ভিজে জামাকাপড়েই খড়ের উপরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। মাঝিরা আপন মনে দাঁড় বেয়ে চলেছিল কিছুই টের পেল না। নৌকো এগিয়ে চলল।

দুশ্চিন্তা, অবসাদ, পরিশ্রম ও অনাহারে মধুর সমস্ত শরীরটা তখন যেন ঝিমিয়ে আসছে।

নৌকো কলকাতার দিকেই চলেছে। ভিজে জামাকাপড়ে উন্মুক্ত গঙ্গার শীতল হাওয়ায় শীত শীত করে। অবসাদে ক্রমে ওর চোখ দুটি বুজে এল।

ঘুম যখন ওর ভাঙল, ও চেয়ে দেখলে মাথার উপর রাত্রির নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ যেন নীচের ঘুমভারানত শান্ত ধরিত্রীর দিকে লক্ষ কোটি চক্ষু মেলে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে ও উঠে বসল। নৌকোটা কোথায় যেন নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই ডাঙা। ভাল করে সামনের দিকে তাকাতেই ওর নজরে এলো, রেলেও লাইন, কয়েকটা মালগাড়ি বোঝাই হচ্ছে। আশেপাশের ডোমে ঢাকা বৈদ্যুতিক বাতিগুলির আব্‌ছা আলো ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

ও ভাবতে লাগল, কোথায় এল। চারিদিকে আরো একটু ভাল করে তাকাতেই ও বুঝলে বাগবাজারের ঘাট এটা। ও আর বিলম্ব না করে নৌকো হতে নেমে সোজা গিয়ে ঘাটে উঠল।

কোথায় যাবে এখন? চট্ করে ওর মনে পড়ল সামনেই চিৎপুরের এক গলিতে ওর এক পুরোনো দিনের দোস্ত করিম মিঞা থাকে।

গলির মধ্যে একটা পুরাতন দোতলা বাড়িতে একখানা ঘর নিয়ে করিম

থাকে। সেখানেই গিয়ে বরাবর ওঠা যাক্!...তারপর ভেবে চিন্তে যা হয় সময় মত করা যাবে।

চিৎপুর রোড ধরে মধু হন হন করে হাঁটতে লাগল। গলির মুখেই ঠিক করিমের বাড়ি।

করিমের দোতালার ঘর থেকে চিৎপুরের রাস্তাটা বরাবর পরিষ্কার দেখা যায়। চিৎপুর রাস্তাটা তখন একদম নির্জন।

দুপাশের দোকানপাট একেবারে বন্ধ। ফুটপাতের উপরে কতকগুলো ভিখারী মুড়িসুড়ি দিয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে আছে। রাস্তার ধারে একটা ডাস্টবিন্ উল্টে পড়েছে। আবর্জনার স্তূপ চারিদিকে ছড়ান। সেই আবর্জনার স্তূপের মধ্যে একটা কুকুর কি সব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। পথের পাশের এক কল থেকে অজস্র ধারায় ঝর ঝর করে জল ঝরছে। জল পড়ার একঘেয়ে শব্দ স্তব্ধ রাত্রির বুকখানা যেন করুণ করে তুলেছে।

মধু এসে তার পরিচিত গলির মধ্যে প্রবেশ করল। দোতালা পুরানো লাল রংএর বাড়িখানা।

নীচের তলায় খান চারেক ঘর। তাতে একটা প্রেস আছে।

উপরের তলায় করিম দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে।

করিম মিঞা। করিমের একটা পরিচয় এখানে প্রয়োজন।

করিমের বয়স ছত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে হবে। রোগা, ঢেঙা, লম্বাটে চেহারা। কপালের দু'পাশে বিস্তীর্ণ টাক। সরু টিয়া পাখীর মত দীঘল নাকটা উপরের পুরু ঠোঁটের উপরে ঝুলে পড়েছে। একটা চোখ কানা।

মুখে বিশ্রী বসন্তের দাগ। মণিহীন শূন্য চক্ষুকোটরটা যেন ক্ষত বিক্ষত মুখ খানার বিভীষিকা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। ডান দিককার নীচেকার চোখর পাতা থেকে থুতনি পর্যন্ত একটা কাটার দাগ।

গালের দু'পাশের হাড় দুটো কুশ্রী ভাবে সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে। দলের লোকদের মধ্যে ও 'কানা করিম' বলেই কুখ্যাত।

এ দুনিয়ায় এমন কমই শয়তানী আছে যা ওর দ্বারা সম্ভব নয়। বড়বাজারে ওর তাঁবে জন পঞ্চাশেক কুলী আছে। ও তাদের সর্দারী করে। কুলিরা সারাদিনের পরিশ্রমে যা উপায় করে, তার বার আনা তাদের ;

বাকী চার আনা করিমের ভাগে যায়।

দিনের আলোয় করিম কুলীর সর্দারী করলেও রাত্রির অন্ধকারে ও যে কি করে, আর কি না করে সেটা খুব কম লোকই জানে।

দলের লোকেরা ওকে যেমন বাঘের মতই ভয় করত, শ্রদ্ধা করতোও ঠিক তেমনি।

করিমের দলের লোকেরা করিমের জন্য প্রাণ দিতে পর্যন্ত পারতো। দিনের আলোয় করিমের যা রোজগার হতো রাত্রির রোজগারের কাছে সেটা নামমাত্র।

পুলিসের খাতায় 'কানা করিমে'র নামটা বেশ মোটা অক্ষরে লেখা থাকলেও তাকে ধরাছোঁয়ার উপায় ছিল না।

কুয়াশার প্রহেলিকার মতই 'কানা করিম' পুলিস মহলে ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। এক সময় কিছু কাল মধু 'কানা করিমের' দলে কাজ করেছিল এবং সেই দলে কাজ করতে করতেই ও ধরা পড়ে ও পাঁচ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মধু 'কানা করিমে'র সঙ্গে দেখা করেছিল। 'কানা করিম' মধুর পিঠে একটা হাত রেখে বলে, 'তুই বাড়ি ফিরে যা মধু, এ রাস্তা তোর নয়। এখানে গোখ্‌রো সাপের মত খল হওয়া চাই। নেকড়ের মত হিংস্র ও শৃগালের মত ধূর্ত টিক্‌টিকির মত নিঃশব্দ গতি হওয়া চাই। এ দলে সকলেই সকলের নিজ নিজ গায়ের চামড়া বাঁচাতে ব্যস্ত। কোনটাই তোর নেই। গায়ে তোর জোর আছে বটে কিন্তু মাথায় তোর তত মগজ নেই। এবার অল্পের উপরে গেছে, কিন্তু এর পর এত অল্পে ছেড়ে দেবে না। তাছাড়া কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠার জায়গায় ঘা হয়। সেই জন্যই আমার দলের নিয়ম, যারা একবার বাঘের থাবা খেয়েছে তাদের আর আমার দলে নাম থাকে না। তাতে করে সকলেরই বিপদ! তবে, চিরদিনই তোকে মনে থাকবে। যদি কখনো বিপদে পড়িস 'কানা করিম'কে মনে করিস। ক্ষমতা থাকলে নিশ্চয়ই সাহায্য করবো।

এর পর আর মধু অগত্যা বাড়ি ফিরে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় না থাকায় নিজের বাড়িতেই ফিরে গিয়েছিল। সেও আজ ছয় মাসের কথা।

মধু যখন কানা করিমের বাড়িতে এসে পৌঁছল, সমস্ত বাড়িটা তখন

রাতের অন্ধকারে সুষুপ্তিমগ্ন।

বাড়ির সদর দরজাটা সারারাত ও সারাদিন খোলাই থাকত!

অন্ধকারে ভাঙা সিঁড়িটা বেয়ে নিঃশব্দে মধু উপরে দোতালায় উঠে গেল।

করিমের ঘরের দরজা বন্ধ!

হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে কার ভ.রী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে? ক্ষণমাত্র বিলম্ব হলো না মধুর বহুপরিচিত কণ্ঠস্বরের মালিককে চিনতে। বুঝলে ও 'কানা করিম'ই কথা বলছে। ও নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দরজার টোকা দিল। টুক্ টুক্ করে দু'বার।

দলের লোককে চিনিয়ে দেবার 'কানা করিমে'র কাছে এটাই ছিল সাংকেতিক শব্দ!

দাঁড়া!..'কানা করিম' ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল। একটু পরেই বন্ধ দরজাটা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে টিম্ টিম্ করে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। বাতিটা থেকে আলোর চাইতে ধূমোদ্গিরণই বেশী হচ্ছে। 'কানা করিম' সামনে এসে দাঁড়াল ঃ কে?

করিম সাহেব! আমি মধু।...

মধু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দরজাটা এঁটে দিল।

মধু, কি ব্যাপার এতকাল পরে হঠাৎ এত রাত্রে অসময়ে কোথা থেকে এলি?

সব বলছি করিম সাহেব। আগে একটু জল খাওয়াও, বড় পিপাসা পেয়েছে।

একটি মাত্র চোখের সতর্ক অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মধুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে করিম ঘরের কোণে রক্ষিত সরাই থেকে একটা ময়লা অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে জল ঢেলে ওর সামনে এগিয়ে ধরল!

আকণ্ঠ পিপাসায় মধুর গলা তখন শুকিয়ে উঠেছে। এক নিশ্বাসে ঢক্ ঢক্ করে মধু গ্লাসের সমস্ত জলটা নিঃশেষ করে একটা মৃদু আরামের নিশ্বাস নিল।

আবার করিম প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কী? এখানে হঠাৎ কি মনে করে মধু?

আমার বড় বিপদ, আর এই বিপদের সময় তোমার এখানে আসা ছাড়া আর কোথায় বা এ সময় যেতে পারি বল করিম সাহেব! কিন্তু শালাদের চোখে আমি ধুলো দিয়েছি। কারও বাবার সাধ্য নেই কোথায় আমি এসেছি তার অনুমান করে।

সেটা তোমার ভুল মধু! তারা সর্বাগ্রে এখানেই আসবে। কেননা সেবারে তুমি আমার সঙ্গে এখানে এসে দেখা করে যাবার পর তোমার খোঁজে সর্বাগ্রে তারা এখানেই এসেছিল। পুলিস জানে যে একদিন তুমি আমার দলে ছিলে।

চৌদ্দ

করিমের কথায় উৎকণ্ঠিত ভাবে মধু বললে ঃ তাহলে কি হবে?

করিম গম্ভীর হয়ে কি যেন খানিকক্ষণ ভাবলে, তারপর মৃদুস্বরে বললে সে সব কথা হবেখন, আগে চট্ করে পাশের স্নানঘরে গিয়ে স্নান করে জামাকাপড়টা বদলে ফেল। দড়িতে আমার জামাকাপড় আছে।

তা যাচ্ছি, কিন্তু বড় ক্ষিদে পেয়েছে যে ভাই।

যা, স্নান করে আয়, খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মধু, আর বাক্যব্যয় না করে জামাকাপড় বদলাতে পাশের ঘরে চলে গেল।

এক বালতি ঠাণ্ডা জলে স্নান করে সারা দিন রাত্রের অসহ পরিশ্রমের ক্লান্তিটা যেন অনেকখানি দূর হলো।

স্নান করে কাপড় বদলিয়ে ও যখন পাশের ঘরে এলো, দেখলে ইতিমধ্যে কখন একসময় করিম একটা শালপাতার ঠোঙায় করে কিছু কচুরী ও মিষ্টি এনে ঘরের কোণে ভাঙা টিনের বাক্সটার উপরে রেখেছে।

করিম খাটের উপরে নিঝুম হয়ে বসে একটা বিড়ি টানছিল, মধুকে স্নান করে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, ঐ যে খাবার এনেছি খেয়ে নে।

মধু খাবারগুলি উদরস্থ করে ঢক ঢক করে আবার এক গ্লাস জল খেয়ে করিমের কাছ হতে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে টানতে লাগল, করিমের পাশে বসেই।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপচাপ থাকে তারপর একসময় করিমই কথা শুরু করে।

তারপর ব্যাপার কী মধু?

করিমের কথার কোন জবাব দেয় না মধু। কি যেন তখনো ভাবছে।

কিরে জবাব দিচ্ছিস না কেন?

কি?

কথাটা খুব গোপনীয়—

বুঝেছি বল।

তোকে বিশ্বাস করতে পারি তো—

আজ এতকাল পরে হঠাৎ একথা?

না তাই বলছিলাম।

বিশ্বাস না হয় বলবি না—

না, না—তা নয়—করিম বিড়ি টানতে থাকে।

মধু এদিক ওদিক চেয়ে বলতে শুরু করে।

বলছিলাম, একটা বড় রকম দাঁও কষেছি, যদি হজম করতে পারি তবে সারাটা জীবন রাজার হালে কেটে যাবে। এখন তোমার সাহায্য পেলেই হয় মিঞা!

করিম মধুর কথার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে বিড়িটা টানতে লাগল।

রাত শেষ হয়ে আসছে।

পূর্বাশার প্রান্ত ঘেষে তখন ভোরের অস্পষ্ট আলো ক্ষীয়মান রাতের অন্ধকারের বুকে একটু একটু করে জেগে উঠছে।

রাস্তার মাল টানা গাড়িগুলোর ঝর ঝর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

পাইপে করে করপোরেশনের জল ছিটিয়ে রাস্তা ধোয়ার শব্দও সেই সঙ্গে শোনা যায়। রিকশার দু'একটা ঠুং ঠুং শব্দও ভেসে আসে।

তোর সাহায্য চাই।

কি সাহায্য?

অবিশ্যি এমনি এমনি নয়। লাভের অর্ধেক তোমার আর অর্ধেক আমার মিঞা!

কত?

তা হাজার পনের তো এক এক জনার ভাগে পড়বেই নেহাৎ কম করেও।

বলিস কি পাল!...ক্ষুধিত শ্বাপদের মত কানা করিমের একটি মাত্র চোখ যেন চক্ চক্ করে ওঠে!...সে জিভটা দিয়ে উপরের পুরু কালো ঠোঁটটা একবার চেটে নিল।

কানা করিম বুঝতে পারে মধু পাল কোন একটা দামী বস্তু অপহরণ

করেছে।

কিন্তু কি সেটা বুঝতে পারে না।

বলোঁ, মালটা কি?

সবই জানতে পারবে ভাগাভাগি হবে যখন।

হুঁ—তা কোথা থেকে পেলে!

ছিল একজনের কাছে।

কে?

সে আর এ জগতে নেই।

নেই?

না। আর বাধ্য হয়েই বেটাকে আমায় খুন করতে হয়েছে।

বল কি! ফের খুন করেছো?

কিন্তু তোমার সাহায্য যদি পাই মিঞা তবে কেউ আমাকে ধরতে পারবে না!...ফাঁসি যাই সেওভি আচ্ছা কিন্তু এমন জিনিসটা কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারলাম না।

কিন্তু জিনিসটা কি পাল?

সব কথা আজ রাত্রে হবে। এখন আমার একটু ঘুমের দরকার। অত্যন্ত ক্লান্ত আমি!

সত্যি ঘুমে ও ক্লান্তিতে মধুর দু'চোখের পাতা যেন সীসার মতই ভারী হয়ে বুজে আসতে চায়।

বেশ তুমি এখন ঘুমোও, আমি এখন কাজে বের হবো। দরজাটা আটকে রাখ। কোথাও আবার যেন বের হয়ো না। আসবার সময় খাবার নিয়ে আসবো।

বেশ তাই হবে। তার চাইতে আর এক কাজ করলে ভাল হয় না মিঞা?

কি?

বাইরে থেকে দরজায় তুমি তালা লাগিয়ে যাও। যদি কেউ আসে বাইরে থেকে ঘরের দরজায় তালা দেওয়া দেখলে মনে করবে ঘরে কেউ নেই।

করিম কি যেন ভাবলে, তারপর ঘাড় হেলিয়ে বললে, মন্দ কথা

বলনি। বুদ্ধিটা যাহোক মাথা থেকে বের করেছো তো দেখছি—বেশ তাই দিয়ে যাবো।

একটু পরে করিম দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল।

মধু নিশ্চিন্তে শয্যার উপরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। বাইরে দিনের আলো তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। চিৎপুর রোডে লোকজন, ট্রাম বাস রিকশার যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে মধু অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল ওর, বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে।

রাস্তার ধারের বন্ধ খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে বিলীয়মান সূর্যরশ্মির ম্লান আলো ঘরের আবর্জনাপূর্ণ ধুলিমলিন মেঝের উপরে এসে পড়েছে।

মধু আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে বসল।

প্রচণ্ড ক্ষুধায় বত্রিশ নাড়ীতে তখন তার পাক দিচ্ছে। একটানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি তখন দূর হয়ে গেছে।

শয্যা থেকে নেমে ঘরের চারপাশ ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মাঝারি গোছের ঘরখানি। আসবাবপত্র সামান্যই। একটা দড়ির খাটিয়া, তাতে বহু পুরাতন মলিন নোংরা একটা তোষক। ততোধিক মলিন একটা চাদর ও খান দুই তেলচিট্‌চিটে মসীধরা মাথার বালিশ।

এককোণে একটা কাঠের বড় আলমারী।

একটা দড়ি দু'পাশের দেয়ালে পেরেক পুঁতে টাঙানো, তার উপরে কতকগুলো মলিন জামাকাপড় ঝুলছে।

একপাশে একটা ভাঙা টেবিল, টেবিলটার উপরে, কতকগুলো খালি কাঁচি মার্কা সিগ্রেটের বাক্স, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

একটা মরিচা ধরা খালি ডালাহীন সিগ্রেটের টিন্‌, তাতে অসংখ্য পোড়া বিড়ি, সিগ্রেট, পোড়া দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও ছাইয়ে ভর্তি।

ওই টেবিলের উপরেই গোটা দুই শালপাতার ঠোঙা ও গোটা কয়েক কাগজের ঠোঙা। একটা আধপোড়া মোমবাতি।

টেবিলটার সামনে একটা ভাঙা হাতলহীন কাঠের নড়বড়ে চেয়ার। ঘরের এক কোণে, একটা মাটির সুরাই, তার উপরে একটা মলিন, অসংখ্য

টোল খাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের জল খাবার গ্লাস।

তারই পাশে একটা ভাঙা ছাতা দেওয়ালের পাশে দাঁড় করান।

ঘরের আর এক কোণে একটা তালাআঁটা টিনের তোরঙ্গ তার উপরে একটা লুংগি স্তূপ করা হয়েছে।

দেয়ালে গোটা কতক কুৎসিত ছবি।

টেবিলের নীচে ধূম্র মলিন একটা হ্যারিকেন।

মধু এগিয়ে গিয়ে আলমারিটা খুলে ঃ কতকগুলি ময়লা কাপড়জামা একপাশে স্তূপ করা আছে, একরাশ আরসোলা ফর্ ফর্ করে চারপাশে উড়ে গেল দরজাটা খুলতেই।

মধু বিরক্তি চিত্তে আলমারির দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

পাশের ঘরে এসে ঢুকল।

পনেরো

এ ঘরেই ও সকালবেলা স্নান করেছিল।

ছোট্ট ঘরটা।

ঘরের মধ্যে জলের কল আছে। ঘরের সংলগ্ন পায়খানা।

ঘরটির মধ্যে একটি মাত্র ছোট জানালা, গরাদহীন।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েই জানালাপথে মাথা গলান যায়।

জানালা দিয়েও উঁকি দিয়ে দেখল সামনেই কোন বাড়ির ছাদ। ছাদে জলে উবুচুবু গঙ্গা জলের একটা ট্যাংক।

ছাদের সামনেই একটা সরু প্রাচীর।

প্রাচীরের ওদিকে একটা পোড়ো মাঠ...মাঠের উপরে সারি সারি কতকগুলো খোলার বস্তি! আবার ও বড় ঘরে ফিরে এল।

জানালাপথেও উঁকি দিল।...লোকজন ট্রাম বাসে রাস্তাটা মুখর।

ঘরের ভিতর থেকেই দেখতে পায় মধু।

বড় রাস্তার ঠিক ওপারেই 'রেবতীমোহনের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'।

হালুইকর প্রকাণ্ড কড়ায় গরম গবম খাস্তা কচুরী ভাজছে।

দু'একজন খরিদ্দারের ভিড়!

দোকানের সামনে একরাশ শালপাতার ঠোঙা জড়ো হয়ে আছে।

একটা কুকুর ঠোঙাগুলো চাটছে।

হঠাৎ যেন ও একটু চমকে উঠলো, একজন সাধারণ ভদ্রগোছের ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোক এই বাড়িটার দিকে স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

মধুর মনে হলো কবে কোথায় যেন লোকটাকে দেখেছে।

চেনা চেনা মনে হয় যেন মুখটা!

কপাল কুঁচকে মধু ভাবতে থাকে! কোথায় লোকটাকে ও দেখেছে!

হঠাৎ ওর মনে পড়ল, হাঁ পুলিসের গোয়েন্দা ও একজন। কিন্তু ও এবাড়িটার দিকে অমনি করে তাকিয়ে আছে কেন? একটা অজানিত আশংকায় মধুর বুকের ভিতরটা যেন কেমন ধ্বক্ করে উঠ্‌ল।...তবে কি

পুলিসের লোক ওর সন্ধান পেয়েছে!

কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে। অনেকক্ষণ ধরে ও লোকটার প্রতি লক্ষ্য রাখলে।

লোকটা দু'একবার রাস্তার আশেপাশে ঘুরে ফিরে আবার এসে লাইট পোস্টের কাছে দাঁড়াল। চোখের দৃষ্টি বরাবর এবাড়িটার দিকেই।

যেখানে লোকটা দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে পরিষ্কার এবাড়িতে ঢুকবার দরজা ও পথটা দেখা যায়। একটা অজানিত আশংকা যেন ঊর্ণনাভের মত ধীরে ধীরে জাল বুনে চলেছে।

মধুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তখন। মধু বাথরুমে গিয়ে ঢুকল, জানালাপথে ও চেয়ে দেখলে সেদিকে কোন প্রহরী আছে কিনা।

আগের বার সে এত লক্ষ্য করেনি, এবারে নজরে পড়ে সেখানেও আছে। বস্তীর সামনে কে একজন সাধারণ বেশে এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

ভয়ে দুর্ভাবনায় মধুর সর্বশরীর যেন বিবশ হয়ে আসে। কি করবে সে এখন? এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।

ওরা যখন এই বাড়ির উপরে নজর রেখেছে, নিঃসন্দেহে এখানে ওর উপস্থিতি জানতে পেরেছে।

পালাতে হবে।

এখান থেকে এই মুহূর্তে যেমন করেই হোক পালাতে হবে।

কিন্তু কোন পথে ও পালাবে। ও যে ঠিক করে রেখেছিল সন্ধ্যার আঁধারে এখান হতে বের হয়ে বরাবর হাওড়া স্টেশনে।

কাশীতে পালিয়ে যাবে, রাত্রি দশটায় দিল্লী মেলে একবার উঠতে পারলে আর ওকে পায় কে?...কিন্তু কি করবে এখন ও? সব যেন ওর কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল।

হাজারো চিন্তা ওর মাথার মধ্যে একটার পর একটা জট্ পাকাতে লাগল!

ও থপ্ করে ঘরের মেঝেতে ধুলো বালির উপরেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। হা ভগবান!

কতক্ষণ ও অমনি করে ঝিম্ দিয়ে মেঝের উপরে বসেছিল তা ওর

মনে নেই। হঠাৎ বারান্দায় কার পায়ের শব্দ পেয়ে চমকে ও মুখ তুললে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে সারা পৃথিবী তখন আবছা হয়ে এসেছে।

বাইরের দরজার তালা খোলার শব্দ হলো। ও বুঝলে করিম ফিরে এসেছে।

দরজা খুলে গেল, হাতে একটা খাবারের ঠোঙা নিয়ে করিম অন্ধকারে ছায়ামূর্ত্তির মত ঘরে প্রবেশ করল, মধু...

মধু চাপা গলায় বললে, দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও মিঞা!

করিম দরজায় খিল তুলে দিল।

আলোটা জ্বালাওনি কেন মধু?

মধু কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে চাপা উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, এত দেরী হলো কেন আসতে তোমার মিঞা?

করিম পকেট থেকে দিয়াশলাইটা বের করে হ্যারিকেনটা জ্বালাতে জ্বালাতে বললে, কি করবো থানা থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

চকিতে উদ্বেগাকুল কণ্ঠে মধু প্রশ্ন করলে, থানা থেকে কেন?

কেন আর! তাদের ধারণা আমার এখানেই তুমি পালিয়ে এসেছো। শ্রীরামপুর থেকে শুরু করে গঙ্গার আশ-পাশ কলকাতার সর্বত্র, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, স্টেশনে তোমার জন্য সর্বত্র পুলিসের চর ঘুরছে।...

বল কি! মধুর গলা শুকিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ—তাদের ধারণা--

কি! কি তাদের ধারণা?

তুমি এখানেই এসেছো—আর না আসলেও এখনো আসতে পার।

তুমি কি বললে?

বললাম ওসব কাজকারবার আমি অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি—কিন্তু যাক সে কথা। একটা কথা শুনে এলাম।

কি?

গোয়েন্দা পূর্ণ চক্রবর্তি বলছিলেন, তোমার কাছে নাকি লাহোরের নবাব আমীর খাঁর অনেক টাকা দামের হীরাটা আছে।

পাগল না ক্ষ্যাপা। সে হীরা আমি কোথায় পাবো, হীরা নেই বটে,

তবে এমন কিছু মূল্যবান জিনিসের সন্ধান আমি জানি, যার মূল্য ত্রিশ হাজারও ছাড়িয়ে যায়। আর কি জিজ্ঞাসা করলে?

আরো কত কথা! ইদানীং তোমার কোন সংবাদ আমি জানি কি না? আমার দল ছাড়া আর কোন দলে তুমি মিশতে কিনা! হাজার রকমের প্রশ্ন! যতটা পারলাম এড়িয়ে এড়িয়ে তো জবাব দিয়েছি, কিন্তু মনে হলো শালারা আমার কথায় খুব বেশী বিশ্বাস রাখেনি। আসার সময় তো দেখলাম নিবারণবাবু বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অ.াছে। এখন কি করবে?

সব আমার কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে মিঞা! জিনিসটা আমার কাছে নেই বটে কিন্তু আমারই জানা জায়গায় লুকানো আছে। কোন উপায়ে যদি সেটার কোন খদ্দের জোটাতে পারি তবে আর কোন চিন্তা নেই। এখন একমাত্র তুমিই আমার ভরসা ভাই! বখরা আধাআধি।

আমি কি করতে পারি বল?

তুমি এখুনি সোজা একেবারে হাওড়া স্টেশনে চলে যাও। সেখানে গিয়ে কাশীর দু'খানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনবে। ট্রেন ছাড়বে রাত্রি সোয়া দশটায়। টিকিট কিনে তুমি প্ল্যাট্‌ফরমের বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, যেমন কোরেই হোক, আমি ঠিক সময় গিয়ে উপস্থিত হবো!

কি?

এখন কি এবাড়ি থেকে বেরুন তোমার উচিত হবে?

তবে!

বরং বলছিলাম আজকের রাতটা বেরুবার কোন চেষ্টা না করাই ভাল।

না, না—আজই আমাকে এ শহর ছাড়তে হবে—

তবে যা ভাল বোঝ কর—

তুমি ভেবো না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেবো।

বেশ।

—তোমায় যা বললাম কর। চলে যাও স্টেশনে আর দেরি করো না।

করিম ঠিক সময়ে চলে গেল।

মধু আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ চুপচাপ

ভূতের মত বসে রইলো।

একবার সে উঠে পায়ে পায়ে অন্ধকারে বদ্ধ জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।...

জানালার খড়খড়ির ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখলে নিবারণ গোয়েন্দা তখনও ঠিক তেমনি করেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তীক্ষ্ণ সজাগ সতর্ক দৃষ্টিতে এই বাড়ির দিকেই তাকিয়ে।

আবার সে বাথরুমের জানালার কাছে গেল। বস্তীর সামনে সে লোকটাও তেমনি ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে, তারও দৃষ্টি এই বাড়ির দিকে!

পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতই মধু অন্ধকার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ফিরতে লাগল।

নীচের তলায় প্রেস চলার ঘরঘর শব্দ হচ্ছে অবিশ্রাম একঘেয়ে।

কি করবে সে? এখন কি করবে, কোন পথে পালাবে।

সময় যত যাচ্ছে চিন্তায় দুর্ভাবনায় সে যেন তত বেশী অস্থির হয়ে ওঠে।

ষোল

মধু ক্রমেই যেন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল।

সমস্ত বিচার ও চিন্তাশক্তি যেন ক্রমেই গুলিয়ে যাচ্ছে, ও স্পষ্টই বুঝতে পারল আইনের সূক্ষ্ম জাল ক্রমেই তাকে চারপাশ হতে জড়িয়ে ধরেছে।

অন্ধকার চিন্তাস্রোতে যেন ভেসে ওঠে দুটো কঠিন লৌহবলয়!...ধীরে ধীরে একটা শক্ত পাকান দড়ি যেন উপরের সিলিং থেকে নামতে থাকে ওকে ধরবার জন্য! এখুনি ও দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে। সভয়ে ও নিজের গলাটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল। অবিশ্যি পুলিসের লোকেরা জানে না যে ও এই ঘরে লুকিয়ে আছে। যতক্ষণ সে এই ঘরের মধ্যে আছে ততক্ষণই সে নিরাপদ। কিন্তু কয়দিনই বা সে এমনি করে ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে পারে!

কাল সকালে কে তাকে খাবার এনে দেবে? দু'দিন হতে সামান্য খাবার খেয়েই আছে ও। করিম চলে গেছে। সামান্য খাবারও হয়তো কাল জুটবে না। কী করবে ও তখন?

যদি আবার করিম ফিরে আসে? কিন্তু তাকেও সে ফিরে আসতে বলেনি! সে হয়ত এখনও তারই জন্য স্টেশনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

আবার ও উঠে বাথরুমের জানালাপথে পালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু না লোকটা একই ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।...পালাবার আর কোন উপায় নেই! হতাশ হয়ে ও বিছানার উপরে শুয়ে চোখ বুজল। কিন্তু কোথায় ঘুম! বোজা চোখের অন্ধ দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে ভয়ংকর সব বিভীষিকা!

বোধ হয় তন্দ্রায় ওর চোখ দুটো বুজে এসেছিল, হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ও চিৎকার করে উঠে বসল ঃ না! না!...কিছুতেই ওরা আমাকে ফাঁসী দিতে পারবে না!...

ঘামে সর্বাঙ্গ তখন তার ভিজে গেছে!...

ভীত চকিত দৃষ্টি মেলে অন্ধকার ঘরের চারপাশে ও তাকাতে লাগলো!

শয্যা হতে উঠে জানালার ধারে গেল...গভীর রাত্রি। নির্জন রাস্তা কিন্তু সেই লোকটা তখনও একই ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে!

বাথরুমে জানালার ধারে গেল, সেখানেও তাই।

আবার ও ঘরের মধ্যে ফিরে এল।

শয্যার উপরে থপ্ করে বসে পড়ে দু'হাতে ও চোখ ঢাকলে!

অজস্র কান্নায় যেন ও ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল।

হাউ হাউ করে ফুলে ফুলে ও কাঁদতে লাগল।

পরের দিন সকালে পুলিসের লোকেরা যখন দেখলে সারারাত্রেও করিম ফিরলে না, তখন তারা এসে করিমের ঘরে হানা দিল। দেখলে ঃ ঘরের দরজাটা হাঁ হাঁ করছে খোলা।

হতভাগ্য মধুর মৃতদেহটা ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে।

কে বা কারা যেন তাকে গলায় একটা দড়ির ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে!

সমস্ত মুখটা হয়ে উঠেছে নীল। কিন্তু হীরাটার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

এতদূর পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে দিলীর খাঁ আবার চুপ করলেন।

মিঃ ঘোষাল বলে উঠলেন, তাহলে নিশ্চয় করিমই ওকে মেরে হীরাটা নিয়ে গিয়েছিল?

কিন্তু করিম তো আগেই বের হয়ে গিয়েছিল।

তা গিয়েছিল। পরে হয়ত আবার এক সময় রাত্রে ফিরে এসে—

কিন্তু—

বুঝতে পারছেন না, হীরাটার কথা যখন সে পুলিসের কাছে শুনেছে—তখন লোভে—

দিলীর খাঁ বললেন, সে আর একটা গল্প মিঃ ঘোষাল।

সুন্দর সিং বললেন, মিঃ ঘোষাল, রাত্রি তিনটে বেজে গেছে এবারে আপনি বাড়ি যান!

না না, প্রবল আপত্তির স্বরে মিঃ ঘোষাল বলে উঠলেন, এতদূর শোনার পর শেষটা না শুনে আমি কখনো যেতে পারব না মিঃ সিং! এখনো হীরাটা পাওয়াই গেল না!...শেষ পর্যন্ত কি হলো শুনতে চাই। শুনতেই হবে আমাকে—সে কাহিনী।

কিন্তু এ যে খুনের পর খুনই হয়ে যাচ্ছে, অথচ কোথায় যে সঠিক হীরাটা কেউ তা জানে না!...কেবলই কি আপনি বলে যাবেন যে প্রত্যেকবারই কেবল কি ভাবে পুলিসের লোকেরা হীরাটা পেয়েও পায়নি সেই কথা।

দিলীর খাঁ বললেন, এতক্ষণ ধরে যা আমি বলেছি, তাতে কোথায় হীরাটা কার কাছে আছে তা আমি বলিনি, হীরাটা সম্পর্কে দু'চারজনের মুখে কেবল কথাই শুনেছি মাত্র! কারও কাছে যে সত্যি সত্যিই হীরাটা ছিল তারও প্রমাণ কোথায়ও পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত!

সুন্দর সিং জবাব দিলেন, তাই যদি সত্যি হয় তবে হীরাটা কোথায় কার কাছে ছিল?

দিলীর খাঁ ধীর স্বরে বললেন, সেটাই তো জানতে হবে। কতকগুলো ঘটনার সূত্র ও কল্পনাকে একত্রে জোড়া দিয়ে সমস্ত রহস্যটাকে আগাগোড়া আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই! এক কথায় যা আমি এতক্ষণ বলেছি ও পরে যা বলতে যাচ্ছি সবই কল্পনার উপরেই বেশীর ভাগ গড়ে তোলা!...

আপনার এ কল্পনাও নিশ্চয়ই কতকগুলো সত্য ঘটনার উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে? সুন্দর সিং প্রশ্ন করলেন।

হাঁ ঠিক তাই!...এবং বিশেষ করে এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার নানা দিক দিয়ে পরিচিত হবার ও ওদের জানবার সুবিধা হয়েছিল।

আচ্ছা একটা কথা, যে গোয়েন্দাটি মধুর মৃতদেহ আবিষ্কার করেন, তিনি কি সেই একই লোক যিনি শ্রীরামপুরে গিয়েছিলেন? সুন্দর সিং প্রশ্ন করলেন।

তা আমি ঠিক বলতে পারি না।

আচ্ছা রুস্তম আলীর কথা তো আর আপনি একবারও বললেন না...সুন্দর সিং আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

না বলিনি, কারণ আপনার হয়ত মনে আছে মিঃ সিং, গল্পের প্রথমেই বলেছিলাম, যে মাথা খারাপ হয়ে তিনি কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। তারপর আর তাঁর কোন সংবাদই পাওয়া যায়নি।

আচ্ছা, করিমের কি হলো? মিঃ ঘোষাল প্রশ্ন করলেন।

গম্ভীর হয়ে দিলীর খাঁ জবাব দিলেন, তার আর কোন সন্ধানই পুলিস পায়নি বহুদিন পর্যন্ত। অবশেষে হঠাৎ তার বাগবাজারের বাড়িতে যখন দেড় মাস বাদে তা'কে পাওয়া গেল, হীরাটা তখন আর অবশ্যই তার কাছে ছিল না। তবু পুলিস কিন্তু করিমের পিছু ছাড়ল না। করিমের অজান্তেই করিমের পিছনেই ওরা দৃষ্টি রাখলে। করিমকে গ্রেপ্তারও করতে পারল না, কেননা করিমের বিরুদ্ধে কোন অপরাধই প্রমাণ করতে পারা যেত না। সে সময় করিমকে প্রায়ই একটা লোকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। লোকটা এক ধনী পার্শীর বাড়িতে সহিস ছিল। করিম সেই সহিস বন্ধুর সাহায্যে পার্শীর আস্তাবলে অশ্বরক্ষকের কাজ পেলে। পার্শী ভদ্রলোকের নাম ছিল মিঃ মেটা। মিঃ মেটার অনেকগুলো রেসের ঘোড়া ছিল। করিম এককালে খুব ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারত। মিঃ মেটার একটা খুব দামী তেজী নূতন ঘোড়া ছিল। কিন্তু কোন সহিসই সে ঘোড়াটাকে বশ করতে পারত না। করিমের হাতে কিন্তু ঘোড়াটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে থাকত।

সতেরো

টালীগঞ্জের দিকে প্রকাণ্ড এক বাগান বাড়িতে মস্ত বড় একটা আস্তাবলে মিঃ মেটা তাঁর ঘোড়াগুলো রাখতেন।

ঘোড়াগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চারজন সাইস ছিল।

করিম এসে সেখানে পঞ্চম হলো।

করিম আসবার দিন দুই বাদে আর একজন অশ্বরক্ষকও নিযুক্ত হলো তার নাম সোরাব। সোরাবের বাড়ি লাহোরের ওদিকে। উঁচু লম্বা বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। স্বভাব অত্যন্ত ধীর ও শান্ত। খুব কম কথা বলে। বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরেই থাকে।

সহিসদের মধ্যে সব চাইতে বেশী দিনের লোক ছিল রহমৎ।

রহমৎ জাতিতে আফ্রিদী...সীমান্ত প্রদেশের লোক। রহমৎ যে শুধু সহিসের কাজই করত তা নয়। ঘোড়ায় চড়তেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিল।

রহমতের সঙ্গে কানা করিমের তত যেন ভাব ছিল না। তাছাড়া রহমৎ ছিল অত্যন্ত একগুঁয়ে। সে সর্বদা তার নিজের ইচ্ছা বা খুশীমত কাজ করত।

মিঃ মেটার সঙ্গে রহমতের সম্পর্কটা যে ঠিক কি ছিল তা কেউই জানত না। কেননা রহমতের সকল অত্যাচার নির্বিবাদে মিঃ মেটা সহ্য করতেন।

লোকেরা বলাবলি করত, রেসের ঘোড়া ছাড়াও মিঃ মেটার নাকি আরো অনেক ব্যবসাই ছিল। কিন্তু সে সব ব্যবসা যে কোন পথে কি ভাবে চলত তা কেউই বড় একটা জানত না।

সপ্তাহে দু' তিন দিন মিঃ মেটা ঘোড়াগুলির তত্ত্বাবধানে এখানে আসতেন। একটা অফিস ঘর ও তৎসংলগ্ন একটা ছোট ঘর এ বাড়িতে মিঃ মেটা ব্যবহার করতেন। এখানেও মাঝে মাঝে দু'একজন লোক মিঃ মেটার সঙ্গে দেখা করতে আসত।

দিলীর খাঁ বলতে লাগলেন, যেদিনের কথা বলছি, আকাশটা সেদিন

সকাল হতেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল।

মাঝে মাঝে ঝির্ ঝির্ করে গুঁড়ি গুঁড়ি এক পসলা বৃষ্টি পড়ে আবার থেমে যায়।

রহমৎ সেদিন সকাল থেকেই যেন বিশেষ একটু চঞ্চল।

দ্বিপ্রহরের দিকে বেশ মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। রহমৎ আস্তাবলের সংলগ্ন ছোট্ট প্রায় অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

পাশেই আস্তাবলের একটা পার্টিশন দেওয়া ছোট অংশে দুষ্ট ঘোড়াটা বাঁধা।

ঘোড়াটার সামনের দুটো পা মোটা শিকল দিয়ে ভূমিসংলগ্ন লোহার আংটার সঙ্গে বাঁধা ঃ পিছনের পা দুটো খোলা।

আজ দু'দিন থেকে ঘোড়াটা বিশেষ একটু ক্ষেপে আছে, মুহুর্মুহু ঘোড়াটা শক্ত পাথরের মেঝের উপরে পশ্চাতের লোহার নাল বাঁধান পা দুটো প্রবল ভাবে ছুঁড়ছে, লোহার নাল শক্ত পাথরের বুকে লেগে ঠং ঠং আওয়াজ তুলছে।

রহমৎ একবার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। যে মতলবটা সে দুদিন ধরে করে রেখেছে করিমকে সে ফাঁদে একসময় না একসময় পা দিতেই হবে!

দুষ্টু ঘোড়াটা যে জায়গায় থাকে টিনের পার্টিশন দেওয়া একটা ছোট্ট খুপড়ীর মত।

অন্যান্য সমস্ত ঘোড়াগুলো থেকেও ঘোড়াটাকে আলাদা রাখা হয়। এবং করিম এখানে চাকরি নিয়ে আসা পর্যন্ত করিমই ঘোড়াটার তত্ত্বাবধান করে।

ঘোড়াটা যেখানে থাকে সেখানে প্রবেশ করবার একটি মাত্রই পথ। তাও মেঝে থেকে সেটা প্রায় হাত দেড়েক উঁচু। সেই প্রবেশপথ হতে একটা তক্তা ঘরের পাশ দিয়ে দেওয়ালের গায়ে একটা লোহার পেরেকের উপরে রক্ষিত।

করিম ওই তক্তাটার উপরেই দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে রাস্তায় ঘোরাতে নিয়ে গিয়েছিল, রহমৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে তক্তার নীচের পেরেকটাকে ঠুকে

আলগা করে রেখে দেয়। যাতে করে এর পর দু'চার বার তক্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করলেই, হুড়মুড় করে তক্তার উপরে দণ্ডায়মান ব্যক্তি নীচে পড়ে যায়। এবং একবার যদি নীচে পড়ে তখন তার সাক্ষাৎ মৃত্যু, ঘোড়ার পায়ের লাথিতে।

কিন্তু করিম আজ দু'দিন শরীর খারাপ থাকায় ঘোড়াটার দিকে বড় একটা যায় না।

সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি তখন থেমে গেছে।

ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিলীয়মান সূর্যরশ্মি বৃষ্টিধৌত গাছপালার উপরে আলোর ফুলঝুরি যেন ছড়াচ্ছে।

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

রহমৎ লাফিয়ে শয্যা হতে উঠে বসল, কর্তা এসেছেন।

রহমৎ ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কর্তার অফিসের দিকে চলল।

অফিস ঘরের মধ্যে ঢুকে ও দেখল মিঃ মেটা কতকগুলি কাগজপত্র টেবিলের উপরে খুলে মনোযোগে কি দেখছেন!

সামনেই টেবিলের উপরে রক্ষিত এক গোছা চাবি!

রহমৎকে ঘরে ঢুকতে দেখে করিম কর্তার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিঃ মেটা মুখ তুলে তাকালেন, কে রহমৎ, কি খবর?

সোরাবকে এখানে আর রাখা চলবে না কর্তা।

কেন?

সোরাব যে কাজ করতে এসেছে সে কাজের সে লোক নয়। এবং কোনদিন জীবনে এ কাজ সে করেওনি।

মিঃ মেটা একান্ত বিস্ময়ে রহমতের মুখের দিকে তাকালেন, তার মানে?

তার মানে ও আসলে একজন গোয়েন্দা।

বল কি রহমৎ!

হাঁ, এই দেখুন ওর পরিচয় পত্র, ওর জামার পকেট থেকে চুরি করে নিয়েছি, বলে রহমৎ একটি 'আইডেন্‌টিটি কার্ড' নিজের জামার বুকপকেট থেকে বের করে মিঃ মেটার সামনে রাখল।

মিঃ মেটা কার্ডখানা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে উদগ্রীব ভাবে

পড়ে দেখলেন।

তারপর বললেন, রহমৎ, তোমার অতীত জীবনের কেরামতি আজও ভুলতে পারনি দেখছি।...তা বেশ, কিন্তু লোকটা তোমারই পিছু নেয়নি তো?

রহমৎ মৃদুকণ্ঠে বলে, না, সে আপনার পিছুই নিয়েছে।

মিঃ মেটা যেন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেছেন, এবং কয়েকটা মুহূর্ত রহমতের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কি বললে, আমার পিছু নিয়েছে?

হাঁ কর্তা আমার সেই রকমই মনে হচ্ছে। আপনারই পিছু নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তারপর একটু থেমে বলে, কিন্তু কেন জানেন কি?

না, কেন?

আমার মনে হয়—

কি মনে হয়?

করিমের সঙ্গে গোপনে আপনার কোন বেচাকেনা চলছে।

করিমের সঙ্গে?

হাঁ—

কিন্তু—

আমার মনে হয় চলছে। এবং এও নিশ্চয় আপনি ভোলেননি যে আমীর খাঁর অপহৃত বহুমূল্য হীরার সংক্রান্ত ব্যাপারে করিমের ঘরেই মধু খুন হয়েছিল। এবং পুলিস প্রমাণের অভাবে করিমকে না ধরতে পারলেও ওর পিছু আজও ছাড়েনি!

এমন সময় একটা দীর্ণ চিৎকার শোনা গেল!

দু'জনেই চমকে উঠলো, ওকি?...

রহমৎ বললে, শব্দটা আস্তাবলের দিক থেকে এলো বলে মনে হচ্ছে।

ঐ সময় একটা সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের গোলমালও শোনা গেল।

মিঃ মেটা রহমৎকে একপ্রকার একপাশে ঠেলেই ছুটে বাইরে চলে গেলেন।

আস্তাবলের দিকে তখন ভীষণ গোলমাল।

মিঃ মেটা আস্তাবলে ঢুকে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়ালেন। সামনেই তার এক হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!

দুষ্টু ঘোড়াটা যেন ক্ষেপে গেছে, পাগলের মত সে পিছনের পা দুটো মুহুর্মুহু পিছনের দিকে ছুঁড়ছে!...

এবং তার পায়ের নীচে মেঝের উপরে হতভাগ্য করিমের রক্তাক্ত দেহটা যেন একটা মাংসপিণ্ডের মতই মনে হয়।

প্রথমটায় সত্যিই বিস্ময়ে যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন মিঃ মেটা।

তারপর নিজেকে সামলে নেন এবং এতক্ষণে বাড়ির অনেকে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সকলকেই তারপর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

কেউ বলতে পারল না কি করে এমন হলো।

শুধু একজন সহিস বললে, করিম আজ দুদিন ঘোড়াটাকে দেখতে পারেনি বলে, ঘোড়াটাকে একটু দলাই মলাই করতে গিয়েছিল, এর বেশী ওরা কিছুই জানে না, হঠাৎ চিৎকার শুনে ওরা সবাই ছুটে আসে, তারপরই দেখে ঐ দৃশ্য!

মিঃ মেটার কেমন যেন মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগে। কাজেই তিনি মনে মনে পুলিসে সংবাদটা দেবেন স্থির করলেন।

উপরে এসে মিঃ মেটা পুলিসে সংবাদ দেবার জন্য রহমতের খোঁজ করলেন, কিন্তু রহমৎকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন তিনি সোরাবের খোঁজ করলেন, তারও কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

হঠাৎ ঐ সময় তাঁর কি মনে হতে চাবির খোঁজ করতে গিয়ে দেখলেন, টেবিলের উপরে তাড়াতাড়িতে চাবিটা তখন ফেলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা টেবিলের উপরে নেই।

দ্রুত পদে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন, সিন্দুকের গায়ে চাবিটা লাগান, সিন্দুকের দরজাটা খোলা।

একটা অস্ফুট শব্দ করে মিঃ মেটা ধপ্ করে মাথায় হাত দিয়ে মেঝের উপরে বসে পড়লেন।

ঐ পর্যন্ত বলে দিলীর খাঁ আবার চুপ করলেন।

মৃদুস্বরে মিঃ ঘোষাল প্রশ্ন করলেন, হীরাটা তাহলে এবারও ফস্‌কে গেল। রহমৎ নিয়ে পালাল!

দিলীর খাঁ কি যেন ভাবছিলেন। কোন জবাব দিলেন না।

সুন্দর সিং মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন, তারপর?

তারপর!

দিলীর খাঁ আবার বলতে শুরু করলেন, এবারে আমি আমার শেষ গল্পে আসব মিঃ সিং। রূপলাল। অর্থাৎ যে রূপলাল এখন এই মুহূর্তে লক্ষ্ণৌ জেলের এক ক্ষুদ্র সেলে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ একবার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন, আর মাত্র তিন ঘণ্টা আছে ফাঁসির!...এবারে আমি রূপলালের ঘটনায় আসছি। রূপলালের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস বিখ্যাত হীরার নৃশংস রক্তঝরা কাহিনীরও শেষ! যাক্ যা বলছিলাম, করিমের মৃত্যুর পর ও রহমতের অদৃশ্য হবার পর সুদীর্ঘ তিন বৎসর হীরাটার বা রহমতের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। যদিচ পুলিস ভারতের সর্বত্র রহমতের সন্ধানে হন্য হয়ে ফিরতে লাগল।

পুলিস সমস্ত স্টেশনে স্টেশনে ভারতের সর্বত্র রহমতের ফটো দিয়ে প্রচার করা হয়েছিল যে সে জীবিত বা মৃত কেউ ধরে দিতে পারবে তাকে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার। কিন্তু তবু কিছু হলো না।

রহমতের কেউ সন্ধান করতে পারল না।

সুদীর্ঘ তিন বৎসর বাদে গল্পের যবনিকা উঠেছে লক্ষ্ণৌ শহরে।

সদর বাজারে একটা ছোট দোতলা বাড়িতে রূপলালডাক্তার আর তার ভাই সুন্দরলাল থাকত।

রূপলালের বয়স সাঁইত্রিশ থেকে আটত্রিশের মধ্যে। সংসারে তার একমাত্র ভাই সুন্দরলাল ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না।

রূপলাল লক্ষ্ণৌ মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে লক্ষ্ণৌ সদর বাজারেই একটা ছোট দোতলা বাড়ি ভাড়া করে ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করে।

নীচের তলায় একটা ঘরে ডাক্তারখানা ও ডিস্‌পেনসারী। আর বাকী দুটো ঘর নিয়ে ওরা দুই ভাই বাস করত।

উপরে দু'খানা ঘর প্রায়ই ভাড়া খাটত।

পুলিসের অনেকদিন ধরেই রূপলালের প্রতি সন্দেহ ছিল, কারণ তারা

সংবাদ পেয়েছিল শুধু ডাক্তারীই নয় ডাঃ রূপলালের আরো ব্যবসা আছে।

আরো ব্যবসা? প্রশ্ন করেন সুন্দর সিং।

হ্যাঁ—চোরাই কোকেনের ও অন্যান্য মালের চোরা ব্যবসা ছিল তার।

এবং সেই চোরাই ব্যবসায়ে রূপলালের ভাই সুন্দরলাল ছিল রূপলালের ডান হাত বা সহকর্মী।

সুন্দরলাল বেশী দূর লেখাপড়া করেনি। তাই রূপলাল ভাইকে কম্পাউণ্ডারের কাজ শিখিয়ে তাকে দিয়ে নিজের ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারের কাজ চালিয়ে নিত!

হঠাৎ এক সময় একটা চোরাই মালের বেচাকেনা সম্পর্কে রূপলাল জড়িত হয়ে পড়ে যার ফলে তার তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়! সেদিন সকালে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করবার পর রূপলাল যখন ঘরে ফিরে এল দেখলে তার বাড়ির উপরের ঘর দু'খানা কে একজন গুরুদয়াল সিং নামে ভদ্রলোক ভাড়া নিয়ে বাস করছে।

সেরাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর দু'ভাইয়ে ঘরে দু'খানা খাটে পাশাপাশি শুয়ে।

হঠাৎ এক সময় রূপলাল ভাইকে বললে, এখানকার পাত্তাড়ি এবারে আমাদের ওঠাতে হলো সুন্দর!

কেন?

কেন আর কি এই ভাবে জেল খেটে আসবার পর, আমার কি আর এ শহরে কোন position থাকবে নাকি! কেউ ডাকবে না আর।...

সেও একটা কথা বটে, কিন্তু কোন নতুন জায়গায় গিয়ে ব্যবসা আবার নতুন করে ফাঁদতে হলে কিছু টাকারও তো প্রয়োজন! যা জমে ছিল, গত তিন মাসে তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাছাড়া তুমি জেলে যাওয়ায় কোকোনের ব্যবসা একদম বন্ধ করে দিয়েছে। শালা ঐ পুলিসের চরগুলো যেন দিবারাত্র ছায়ার মতই এ বাড়ির আশেপাশে ঘুরত!

বেশ করেছিস!...কিন্তু এখন টাকার উপায় কি করি বল দেখি?

টাকা পাওয়ার পথ তোমাকে আমি বাতলে দিতে পারি।

কি বলছিস তুই?

হ্যাঁ—শোন—

সুন্দরলাল ভাইয়ের খাটের উপর এসে বসে মৃদু চাপা কণ্ঠে বলে, লাহোরের নবাব আমীর খাঁর একটা বিখ্যাত বহু মূল্যবান হীরা চুরি গিয়েছিল অনেক দিন আগে তা জান?

হঠাৎ সুন্দরলালের মুখে সেই হীরার কথা শুনে যেন চমকে ওঠে রূপলাল ডাক্তার। কয়েকটা মুহূর্ত ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর মৃদু কণ্ঠে বলে, হাঁ...শুনেছিলাম বটে, কিন্তু—

ইচ্ছা করলে হীরাটা হয়ত তুমিও পেতে পারো...আর হীরাটা পেলে আমাদের আর ভাবনা কি?

ততক্ষণে রূপলাল উৎসাহে উত্তেজনায় শয্যার উপরে উঠে বসেছে।

বলিস কি সুন্দর?

চুপ, আস্তে, চেঁচিও না!...শোন তবে বলি, আমাদের উপরের ঘরটা যে ভাড়া নিয়েছে না, ওই গুরুদয়াল—

হাঁ তাতে কি?

উপরের ঘরের দরজায় চাবি লাগানোর ফোকর দিয়ে কান পেতে একদিন ওর কথা শুনেছি। একটা লোকের সঙ্গে ও দরজা বন্ধ করে তখন কথা বলছিল, শুনলাম ও আমীর খাঁর হীরাটা সম্পর্কে লোকটার সঙ্গে বেচাকেনার কি সব কথা বলছে!

বলিস কি?...সত্যি?

সত্যি না তো কি মিথ্যে? শোন তবে বলি, লোকটা একা, সঙ্গে একটা কুকুর আছে। পোষা বিলিতী কুকুর!...লোকটা রাঁধে বাড়ে না। আমার কাছ থেকেই খায়। খাওয়ার জন্য ও আলাদা টাকা দিয়েছে। রোজ রঘুয়াকে দিয়েই রাত্রে ওর ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিই। সেদিন রঘুয়া আসেনি জ্বর। নিজেকেই আমার রাঁধতে হলো। রান্না হয়ে যাবার পর আমি নিজেই ওর ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার দিকে কে একজন ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, ভেবেছিলাম, লোকটা বুঝি ততক্ষণ চলে গেছে, কিন্তু খাবার নিয়ে উপরে গিয়ে দেখি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ!...

তারপর?

কি করবো তাই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি হঠাৎ শুনতে পেলাম ভিতর থেকে গুরুদয়ালের গলা, কি সব টাকা ও হীরার কথা

বলছে। চট্ করে চাবির ফোকরে কান পেতে দাঁড়ালাম। শুনলাম আমীর খাঁর হীরাটার বেচা কেনার কথা হচ্ছে!...

লোকটা কি করে?...

তা তো জানি না। কি সব ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে নাকি এখানে এসেছে। তুমি যাবার দিন দশেকের মধ্যেই যে ভাড়াটে ছিল, সে তোমাকে জেলে যেতে দেখে একমাসের ভাড়া দিয়ে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, তারপর দু'মাস এ শহরে 'কউ আর ঘর ভাড়া নেয়নি। এদিকে আমার টাকার অভাব। বুঝলাম এখানকার জানা লোকজন কেউ এ ঘর ভাড়া নেবে না। তখন একটা মতলব ঠাউরে হোটেলে হোটেলে ঘুরতে লাগলাম যদি কোন হোটেলের লোককে ভাড়াটে পাকড়াও করতে পারি। ঐ ভাবে খুঁজতে খুঁজতেই গুরুদয়ালের সঙ্গে একদিন পরিচয়। গুরুদয়াল সস্তায় একটা ঘর খুঁজছিল মাস দু'য়েকের জন্য। আমার কাছে অল্প ভাড়ায় ঘরের সন্ধান পেয়ে তখুনি আমাদের বাড়িতে উঠে এল। লোকটা যে কি ঠিক করে জানি না। বেশীর ভাগ সময়ই দিনে ঘরে বসে থাকে, মাঝে মাঝে রাত্রে বের হয়ে যায়। অনেক রাত্রে আবার ফিরে আসে। এবং প্রায়ই দেখি লোকজন সব ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে!...

লোকটার সঙ্গে কি কি জিনিসপত্র আছে?

'একটা চামড়ার সুটকেস, একটা মাঝারী আকারের স্টীল ট্রাংক ও একটা বিছানা!

হুঁ!...বলে রূপলাল গুম হয়ে বসে রইলো!...তার মাথার মধ্যে তখন হাজারো চিন্তা কিলবিল করছে!

আমীর খাঁর বহু মূল্যবান সেই হীরা চুরি যাবার কথা ও বহু আগেই শুনেছে! হাতের মুঠোর মধ্যে সেই হীরা আজ এসে অতর্কিতে পৌঁছেছে। একটুখানি বুদ্ধির খেলা তারপরই ব্যস্। কেউ জানবে না! একটা ক্রূর পৈশাচিক হাসি ওর মুখখানার রেখায় জেগে ওঠে।

কি ভাবছো দাদা?

তুই এখন ঘুমো আমাকে একটু ভাবতে দে!

সুন্দরলাল শয্যা হতে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল অস্থির পদে!...

আঠারো

দিন দুই পরের কথা!

সুন্দরলাল এ দু'দিন আর বাড়ি থেকে কোথাও বের হয়নি!...

মাঘ মাস।

লক্ষ্ণৌতে তখন প্রচণ্ড হাড় কাঁপান শীত পড়েছে।

সকাল বেলা সুন্দরলাল রঘুয়ার হাত দিয়ে গুরুদয়ালকে প্রাতঃকালীন চা পাঠিয়ে দিল।

রঘুয়া চা দিয়ে এসে বললে গুরুদয়ালের শরীর আজ খারাপ। জ্বর জ্বর ভাব হয়েছে, সে খাবে না। শুধু এক গ্লাস গরম দুধ যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রঘুয়ার হাতে দুধ কেনবার জন্য একটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।

ঘরের মধ্যে একটা ভারী কম্বলে মুড়ি দিয়ে রূপলাল চা পান করছিল, রঘুয়ার কথা শুনে তখুনি সে ভাইকে ডাকলে, সুন্দর!

সুন্দরলাল এসে ঘরে প্রবেশ করল, আমাকে ডাকছিলে দাদা?

বোস কথা আছে!

দু'ভায়ে তখন বসে বসে অনেক পরামর্শ হলো!...

সন্ধ্যার দিকে রঘুয়া নিত্যকারের মত বাসায় চলে গেল।

রঘুয়া সস্প্যানে করে দুধ চুলোর উপরে চাপিয়ে রেখে গিয়েছিল।

রূপলালের নির্দেশ মত একটা কাঁচের বড় গ্লাসে করে গরম দুধটা একটা কাঁচের প্লেটের ওপরে বসিয়ে সুন্দরলাল সেটা দাদার সামনে এনে রাখল।

পাশের ডিস্‌পেনসারী ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত্রি নটা ঘোষণা করলে।

শীতের রাত্রি, এর মধ্যেই চারিদিক যেন নিঝুম হয়ে গেছে।

বিশেষ করে সদর বাজারে আবার তেমন লোকের বসতি নেই!

রূপলাল কাঁচের প্লেট্ সমেত দুধের গ্লাসটা হাতে তুলে নিল, দাঁড়া দুধটা আমিই উপরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রূপলাল ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল!

উপরে গিয়ে দেখে গুরুদয়ালের ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ।

রূপলাল দরজায় টোকা দিল।

ঘরের ভিতর থেকে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল! সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলায় প্রশ্ন এলো ঃ কে?

আপনার রাত্রের দুধ এনেছি!

দাঁড়াও!...জবাব এলো।

একটু পরেই দরজা খুলে গেল। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে!

গুরুদয়াল সামনে দুধের গ্লাস হাতে রূপলালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, একি! আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন? রঘুয়া কোথায়?

তাতে আর কি হয়েছে! এই বিদেশ বিভূঁয়ে আপনি একা আছেন আমরা না দেখলে কে আর আপনাকে দেখবে বলুন তো? রঘুয়াটার বাড়িতে অসুখ, তাই আবার তাড়াতাড়ি চলে গেল ছুটি নিয়ে আজ। তাছাড়া আমি নিজেও একজন ডাক্তার, আমার ভাইয়ের মুখেই শুনলাম আপনি অসুস্থ। তাই ভাবলাম দুধটা দিয়ে আসি অমনি একবার দেখেও আসি! তা কী হয়েছে আপনার?...বলতে বলতে রূপলাল সামনের ছোট টেবিলটার উপরে দুধের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল!

বসুন...ওই চেয়ারটায়!...অনেক দিন থেকেই হার্টের ব্যারামে ভুগছি!—কাল রাত্রি থেকেই প্যালপিটেশনটা বেড়েছে। সঙ্গে আবার একটু জ্বর জ্বর ভাবও হয়েছে! এইত কিছু দিন আগে আপনি তখন ছিলেন না, হঠাৎ একদিন রাত্রে দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি! আপনার ভাই সংবাদ পেয়ে ডাক্তার ডেকে আনেন। তাই রক্ষা!

আচ্ছা এখন আর আপনাকে তাহলে বিরক্ত করবো না। গরম দুধটা খেয়ে শুয়ে পড়ুন! কাল সকালে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে যা হয় ঔষধপত্র দেওয়া যাবেখন। বলতে বলতে রূপলাল উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ গুরুদয়ালের কুকুরটার দিকে তাকিয়ে যেতে যেতে থেমে গিয়ে রূপলাল বললে, বাহ্ খুব সুন্দর কুকুর তো আপনার? কী জাত?

স্প্যানীয়াল...মাস দুয়েকের বাচ্চা! দিল্লীতে এক সাহেবের খানসামার কাছ থেকে কিনেছি।

কুকুর আমিও বড্ড ভালবাসি! এটা বোধহয় সারাদিন আজ কিছুই খায়নি!

না। আজ আমার সঙ্গে সঙ্গে ও উপবাস দিয়েছে!

আমাদের আজ মাংস রান্না হয়েছিল!...নিয়ে যাই কুকুরটাকে, মাংস এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। বেচারী উপোস করে থাকবে!

বেশ তো নিয়ে যান না!

রূপলাল আদর করে কুকুরটাকে বুকে তুলে নিল!

দরজাটা বন্ধ করে দিন যা ঠাণ্ডা পড়েছে আজ আবার, কুকুরটাকে নীচেই আমাদের ঘরে রাখবোখন!

না, না টমি নীচে থাকবে না...রাত্রে ও আমার কাছেই থাকে নইলে ও থাকতে পারে না।

রূপলাল হাসতে হাসতে জবাব দিলে ঃ বেশ!

রূপলাল নীচে নেমে এলো!

কুকুরটাকে বুকে করে রূপলাল সোজা বাথরুমে চলে গেল, আসবার সময় কয়েকটা মাংসের হাড় রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছিল।

মাংসের হাড় কটা কুকুরটার সামনে ফেলে দিতেই কুকুরটা হাড়গুলো নিয়ে মেতে উঠলো।

রূপলাল নিঃশব্দে বাথরুমে দরজার শিকল তুলে নিজের ঘরে এসে ঢুকল!

ঘরে ঢুকে রূপলাল দেখলে সুন্দরলাল খাটের উপরে গালে হাত দিয়ে নিঝুম হয়ে বসে আছে।

দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ও একবার মুখ তুলে দাদার দিকে তাকাল।

রূপলাল নিঃশব্দে এগিয়ে এসে নিজের শয্যার উপরে উপবেশন করে, পকেট থেকে সিগ্রেটের বাক্সটা বের করে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিঃশব্দে টানতে লাগল।

উনিশ

বোধ হয় মিনিট পনেরও হয়নি হঠাৎ একটা দীর্ণ কাতর আর্তনাদে যেন স্তব্ধ শীতের রাত্রি কেঁপে উঠল।

ব্যাপার কি! কিসের আর্তনাদ?

দুজনেই এক সঙ্গে চমকে লাফিয়ে ওঠে।

ঐ সময় উপরের তলায় একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দও যেন শোনা গেল। রূপলাল ঘরের স্তিমিত আলোয় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, সুন্দরলালের সমগ্র মুখখানা যেন রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

সমগ্র মুখখানা জুড়ে একটা পরিপূর্ণ আতঙ্কের ভাষাহীন প্রকাশ। দু চোখের দৃষ্টিতে ভয় ও সংশয়।

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে সুন্দরলাল প্রশ্ন করলে, ও কি! কিসের শব্দ হলো?

চুপ! আস্তে! এতক্ষণে বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেছে!

কি বলছো তুমি ভাইয়া?

হাঁ ঠিকই বলছি দুধের সঙ্গে বিষ দিয়েছিলাম!

বিষ!...আতঙ্কে সুন্দরের চোখের তারাদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল!

না, না—এ—এ তুমি কি করলে ভাইয়া। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় সুন্দরলাল। বোস! রূপলালের কণ্ঠে কঠিন আজ্ঞার অনুশাসন!

সুন্দরলাল কাঁপতে কাঁপতে শয্যার উপরে থপ করে বসে পড়ল! শীতের রাত্রেও তার সর্বশরীরে তখন ঘাম দেখা দিয়েছে।

রূপলাল তখন ভাইকে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ঃ যা করবার আমি করেছি। এ ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না হীরাটা হাতাবার! কিন্তু এখন আমাদের নার্ভ হারালে চলবে না! যা বলি মন দিয়ে শোন। আমি জানি, হীরাটা ওর কাছেই আছে! তোকে জিজ্ঞাসা করলে তুই বলবি, দুধটা গরম করে তুই আমার হাতে দিস, আমি উপরে গিয়ে দুধটা দিয়ে আসি! তার বেশী আর আমরা কিছু জানিও না শুনিওনি। আমাদের মধ্যে

যে সব কথা হয়েছে সে তুই আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না। উপরে গিয়ে এখুনি ওর বাক্স খুঁজে হীরাটা বের করতে হবে। এখন উপরে চল!

কিন্তু আমি, আমি তো লোকটাকে খুন করতে বলিনি তোমাকে ভাইয়া! এ কাজ কেন তুমি করলে?

—কি! কি বললি?

—আমি তো তোমাকে বলিনি লোকটাকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে—

—সুন্দর—

—এ কাজ তুমি কেন করলে ভাইয়া।

তোর—তোর জন্যই আমি করেছি।

হাঁ, তুই বলেছিস! এখন ন্যাকা সাজলে হবে কেন? তুই-ই আমাকে হীরার কথা বলে মনে লোভ জাগিয়েছিলি, তুই না বললে?

কিন্তু আমি তোমাকে খুন করতে বলিনি, বলেছিলাম, চুরি করে হীরাটাকে সরাতে!

থাম্ এখন। বোকার মত ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না...উপরে চল, এখনও অনেকখানি দুধ আছে, আর একটা কাঁচের গ্লাসে করে দুধ ঢেলে নিয়ে আয়!...

সুন্দর কাঁপতে কাঁপতে রূপলালের নির্দেশ মত, আর একটা কাঁচের গ্লাসে করে দুধ ঢেলে নিয়ে এল।

সুন্দরের হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নিয়ে রূপলাল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল, সুন্দর তার পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল, দু'জনে এসে আগে পিছু ঘরে ঢুকল।

দেখলে মেঝের উপরে গুরুদয়ালের দেহটা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। ঘরের টেবিলের উপর থেকে আলোটা তুলে নিয়ে মৃতের মুখটা একবার লক্ষ্য করে রূপলাল বললে, বেটা সাবাড় হয়ে গেছে।

তারপর ও আলোটা ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখে, পকেট থেকে একটা চামড়ার দস্তানা বের করে, দস্তানাটা চট্‌পট্ পরে ফেলল। তারপর মৃত ব্যক্তির জামার পকেট হাতড়াতে লাগল চাবির জন্য।

মৃতের পকেটে একগোছা চাবি পাওয়া গেল।

সেই চাবি দিয়ে ও প্রথমেই সুট্‌কেশটা খুলে ফেলল। সুট্‌কেশে কতকগুলো কাপড় জামা ভাঁজ করা আছে, একপাশে একতাড়া দশটাকার নোট একটা রঙিন সুতো দিয়ে বাণ্ডিল বাঁধা!...টাকার বাণ্ডিলটা ও নিজের জামার পকেটের মধ্য গলিয়ে দিল।

সুটকেশটা ও তন্ন তন্ন করে খুঁজলে কিন্তু হীরাটার কোন সন্ধানই পেল না! সুটকেশে না পেয়ে ও স্টীল ট্রাঙ্কটা খোলবার জন্য এগিয়ে গেল, কিন্তু ট্রাঙ্কটায় একটা নম্বরী জার্মান তালা লাগান। ও তালা চাবিতে খোলে না, খুলতে হলে নম্বর মিলিয়ে খুলতে হয়। কিন্তু নম্বরটা তো ও জানে না। দু'একবার ও চেষ্টা করলে দু'একটা নম্বর দিয়ে কিন্তু তালাটা খুলল না। বিরক্ত চিত্তে উঠে দাঁড়াল রূপলাল।

সুন্দর একটি পাশে আগাগোড়া স্থাণুর মতই দাঁড়িয়ে।

সুন্দরের সব কিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে যেন কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে তখন।

রূপলাল ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললে, যাক্ এক পক্ষে ভালই হয়েছে, লোকটা যখন পড়ে যায় টেবিলের কোণায় লেগে ওর কপালটা কেটে গেছে দেখছি। কাটা জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে!...গ্লাসে এখনও দেখছি অর্ধেকের বেশী দুধ আছে। তুই এক কাজ কর, ঐ গ্লাসটা নীচে নিয়ে গিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেল, এবং এই গ্লাসটা তুলে রাখ আলমারীতে। বাকী যা যা এখানে করবার সব ঠিকঠাক করে এখুনি আমি নীচে যাচ্ছি। তারপর বাকী কাজ করা হবে।

কি করবে?

ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? সব হবেখন। তোকে যা বললাম আগে তাই তুই কর!

দুধের সঙ্গে কী বিষ মিশিয়েছিলে দাদা?

তা দিয়ে তোর দরকার কি, তোকে যা বললাম তাই কর! যা আর দেরি করিস না সময় বয়ে যাচ্ছে। এখনো অনেক কাজ বাকী।

সুন্দরলাল তার দাদার নির্দেশ মত দুধের গ্লাসটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে কোন মতে যেন টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল!

অন্ধকার সিঁড়ি।...

সামনের খোলা বারান্দা দিয়ে হু হু করে শীতের হাওয়া যেন হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

সুন্দরের সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে, পা দুটোও যেন কিছুতেই ঠিক করতে পারে না!

সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় হাতের কাঁপুনির ছলকে গ্লাস থেকে খানিকটা দুধ সিঁড়ির উপরে পড়ল! হঠাৎ হাওয়ায় উপরের ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল, সেই শব্দে আবার ও কেঁপে উঠল, আবার খানিকটা দুধ ছলকে সিঁড়িতে পড়ল।

রূপলাল ডাক্তার!

সত্যই সে অদ্ভুত চরিত্রের। অসাধারণ তার মনের শক্তি! নিজের হাতে একটা জলজ্যান্ত লোককে খুন করেও সে এতটুকু বিচলিত হয়নি!

...মানুষের বুকের ভিতরের ঘুমন্ত শয়তান যখন জেগে ওঠে, বোধ করি এমনি করেই জেগে ওঠে। সেই জেগে ওঠা শয়তানের হাতে তখন সে ক্রীড়নক মাত্র।

ডাক্তারী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে রূপলাল জানত বিষ প্রয়োগে মানুষকে মারা কত সহজ। এবং বিষ প্রয়োগে খুন করাও যেমন সহজ ধরা পড়বার সম্ভাবনাও তেমনি খুব বেশী।

তীব্র মারাত্মক বিষের মধ্যে, আরসেনিক প্রুসিক অ্যাসিড্ ও পটাশিয়াম সায়ানাইড্,—সহজেই এর যে কোনটির দ্বারা যে কাউকে মারা যায় কিন্তু উক্ত তিনটি বিষই মৃতদেহের ময়না তদন্তে ধরা পড়তে পারে।

অতএব এমন মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করতে হবে যা সহজে ময়না তদন্তের ফলে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে না, যদি না, ঐ বিষ প্রয়োগ সম্পর্কে কোন বিশেষ সন্দেহের কারণ থাকে।

সেইজন্যই ও এমন একটি বিষ প্রয়োগ করেছিল গুরুদয়ালকে হত্যা করতে যাতে করে কোন সন্দেহেরই কারণ না থাকে বিষ প্রয়োগ সম্বন্ধে এবং সে প্রয়োগ করেছে 'সিউতো একোনাইটিন' এবং এক ফোঁটা মাত্র 'সিউতো একোনাইটিন্' এক গ্লাস দুধের মধ্যে মিশিয়ে ও গুরুদয়ালকে খেতে দিয়েছিল।

একটা বিচিত্র কুৎসিত হাসির বিদ্যুৎ যেন মুহূর্তে রূপলালের ভয়ংকর মুখের উপরে জেগে উঠে মিশিয়ে গেল!

দুধ ভর্তি দ্বিতীয় গ্লাসটা টেবিলের উপরে রেখে দিলে ঠিক জায়গা মত। তারপর পকেট হতে একটা লোহার রড ও ছেনি বের করে চট্‌পট স্টীল ট্রাঙ্কটার একপাশে খানিকটা কেটে জোরে চাড় দিয়ে ডালাটা ভেঙে ফেললে। কিন্তু ট্রাঙ্কটার ভিতরেও তার অভীপ্সিত বস্তুর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না,আরও দুটো নোটের বাণ্ডিল পাওয়া গেল।

বাক্সটাকে ঐ ভাবে ভাঙা অবস্থায় ছত্রাকার করে মেঝের উপরে ফেলে রেখে কৌশলে ও উপরের দরজাটা বন্ধ করে নীচে নেমে এল।

নীচের ঘরে ঢুকে ও দেখলে সুন্দর ভূতের মত চুপ করে বসে আছে। রূপলালকে ঘরে ঢুকতে দেখে ও মুখ তুলে তাকাল।

রূপলাল পকেট থেকে নোটের তাড়া তিনটে বের করে শয্যার উপরে বসে গুণতে লাগল।

তিন বাণ্ডিলে প্রায় পাঁচ হাজার মত টাকা আছে। নোটের বাণ্ডিলগুলো ও তাড়াতাড়ি ওর পুরাতন একটা ভাঙা জুতোর বাক্সের মধ্যে ভরে তার মধ্যে কতকগুলো ছেঁড়া নেকড়া চাপা দিয়ে বাক্সটা বারান্দার আবর্জনার স্তূপের মধ্যে সাবধানে রেখে দিয়ে এল।

সুন্দরলাল তখনো ঝিম্ মেরে ঘরের মধ্যে বসে আছে।

ভাইয়ের মুখের দিকে একবার তাকাল।

রূপলাল বলতে লাগল, তারপর এবারে আমাদের পুলিসে খবর দিতে হবে।

সুন্দরলাল ভয়ানক চমকে দাদার মুখের দিকে তাকাল। পুলিসে? হাঁ পুলিসে। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আবার বললে রাত্রি এগারটা বাজতে মিনিট দশেক আছে। ঠিক এগারটার সময় আমি থানায় খবর দিতে যাবো। তাদের বলবো, আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। পুলিসকে বলা হবে গুরুদয়াল লোকটা কেমন যেন একটু সন্দেহজনক চরিত্রের ছিল। ওর সঙ্গে প্রায়ই নানা ধরণের লোক দেখা করতে আসত। তুই সেই সব দেখে ওকে বলেছিলি বাড়ি ছেড়ে দিতে এবং গুরুদয়াল যেন সর্বদা কি একটা ভয়ে ভীতত্রস্ত থাকত!

সুন্দরলাল দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগল।

রূপলাল বলতে লাগল, বলব, আজ রাত্রি প্রায় দশটা সাড়ে দশটার সময় একটা শব্দ উপরের তলায় আমরা শুনতে পাই। আমাদের মনে হয় কারা যেন কথা বলছে। তারপরই একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দ! শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উপরে চলে যাই, কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় আমরা ঘরে ঢুকতে পারিনি, গুরুদয়ালের নাম ধরে তখন কত ডাকাডাকি করি কিন্তু কোন সাড়া শব্দই পাওয়া যায় না। উপরের ব্যবস্থা আমি সবই ঠিক করে এসেছি। আমাদের উপরের ঘরের জানালার কোন শিক নেই শুধু কাচের সার্সী, সেটা খুলে রেখে এসেছি। পাশের ঐ খালি বাড়িটার গ্যারেজের ছাদটা ঠিক ঐ জানালারই নীচে। পুলিস মনে করবে চোর ঐ জানালা পথে এসে সব কাজ হাসিল করেছে। তুই তো জানিস কেমন করে আমাদের উপরের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া যায়। ঠিক সেই ভাবেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। যাক্ শোন তারপর—এদিকে আমরা যখন উপরে ওর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছি হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন পাশের বাড়ির গ্যারেজের উপর লাফিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আমি নীচে ছুটে যাই। কে একটা লোক তখন অন্ধকারে বাড়ির পেছনের মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে রেললাইনের দিকে চলে গেল। তাই আমরা আর উপায়ান্তর না দেখে পুলিসের কাছে গেছি। একটা কথা মনে রাখিস পুলিস এসে যখন দরজা ভেঙে ফেলবে, ঘরের মধ্যে লোকটাকে ও ভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমরা কিন্তু ভয়ানক চমকে উঠবো।

ওই টাকাগুলোর কি হবে?

ও তো চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে প্রমাণ হয়ে যাবে।

পুলিসের লোক এসে যখন ডাক্তার ডাকবে?

—তা ডাকুক না। ডাকলে ক্ষতি কি।

—কিন্তু—

তা ছাড়া তুই বলবি, ইতিমধ্যে নাকি ওর হার্টের অসুখ হয়, তুই ডাক্তার ডেকে এনে দেখিয়েছিলি?

যদি বলি কোন ডাক্তার?

বলবি সদর বাজারের গণপতি ডাক্তারকে।

সেই এসেছিল গুরুদয়ালকে একবার দেখতে।

তবে আর কি তাকেই যখন ডাকা হয়েছিল সে তো জা· ৲ লোকটা হার্ট ডিজিজে ভুগছিল।

হুঁ।

বেশ তবে তুই এখন দরজার সামনে এসে দাঁড়া, আমি দেখি থানায় খবর দিই গে!...

রূপলাল অন্ধকারে রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতদূর বলে দিলীর খাঁ হঠাৎ আবার থামলেন।

কুড়ি

মিঃ ঘোষাল প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এত ব্যাপার আপনি জানলেন কি করে খাঁ সাহেব?

—সুন্দরলালের জবানবন্দী থেকে।

দিলীর খাঁ অতঃপর সুন্দর সিংয়ের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, এর পরের ব্যাপার তো আপনি সবই জানেন মিঃ সুন্দর সিং কেননা আপনিই রূপলালকে ধরেন। সুন্দরলাল পাগল হয়ে গেছে! আর রূপলালের আজ ফাঁসী! আমার এইখানেই শেষ!

মিঃ ঘোষাল প্রশ্ন করলেন, কিন্তু হীরাটা?

মিঃ স[illegible] সিং জানেন হীরাটা পাওয়া গিয়েছিল কিনা, এবং পাওয়া গে[illegible] কোথায়?

[illegible]লেন, হাঁ পাওয়া গিয়েছিল...গুরুদয়ালের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসত, তাদেরই মধ্যে একজন 'রামস্বরূপ' বলে তারই কাছে পাঁচ হাজ[illegible]কায় গুরুদয়াল হীরাটা বেচে ছিল। রামস্বরূপকে ধরতেই হীরাটা তা[illegible]ছে পাওয়া গিয়েছিল!

তবে আপনি যে বলছিলেন খাঁ সাহেবের হীরাটা পাওয়া যায়নি?

আ[illegible]াম না!...মৃদুস্বরে দিলীর খাঁ জবাব দিলেন।

রাত্রি প্রায় [illegible]রটে বাজে মিঃ সিং এবারে চলুন বাড়ি ফেরা যাক! মিঃ ঘোষাল বললেন।

আপনি যান মিঃ ঘোষাল, দিলীর খাঁ জবাব দিলেন, ওর সঙ্গে গোটা [illegible]তক আমার কথা আছে, উনি যাবেখন একটু পরে।

মিঃ ঘোষাল বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

মিঃ ঘোষাল চলে যাবার পর দুজনে কিছুক্ষণ নির্বাক! হঠাৎ একসময় স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মিঃ সিংই বললেন, কি কথা আমার সঙ্গে আছে আপনার খাঁ সাহেব?

একটা সত্য যাচাই করে নেওয়া শুধু। আপনি একটু আগে মিঃ

ঘোষালকে বলছিলেন রামস্বরূপের কাছে নাকি হীরাটা পাওয়া গিয়েছিল, কথাটা কি সত্যি?

নিশ্চয়ই—

বললেন দৃঢ় কণ্ঠে মিঃ সিং।

সঙ্গে সঙ্গে দিলীর খাঁ সুন্দর সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, না—

কি না?

আপনি যা বললেন মিঃ সিং তা ঠিক নয়।

তার মানে?

সুন্দর সিং তাকালেন দিলীর খাঁর মুখের দিকে—কি বলতে চান খাঁ সাহেব।

বলতে চাই যে রামস্বরূপের কাছে সেদিন যে হীরাটা পাওয়া গিয়াছিল সেটা আদৌ আমীর খাঁর সেই হীরা নয়।

কি বলছেন আপনি খাঁ সাহেব!

ঠিকই বলছি। সেটা আসল হীরা নয়।

তবে কি?

সেটা একটা নকল Synthetic হীরা, যার দাম হাজার টাকার উপরে হবে না।

হঠাৎ যেন অতঃপর মিঃ সিং স্তব্ধ হয়ে যান। তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হয় না।

বলুন মিঃ সিং, কথাটা সত্যি না মিথ্যে?

সুন্দর সিং এবারে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, কথাটা সত্যি! কিন্তু আমি ভাবছি—

কি ভাবছেন! কথাটা আমি কি করে জানলাম তাই না?

হাঁ—যে কথাটা আমি এবং পুলিসের বড় কর্তা ব্যতীত—তৃতীয় কারোর জানবার কথা নয়—সে কথাটা—

আমি কি করে জানলাম। যেমন করেই হোক কথাটা জানি আমি আর এও জানি আসল হীরাটা এখনো কার কাছে আছে।

চমকে মিঃ সিং খাঁ সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন, বলেন কি?

হাঁ—জানি।

কিন্তু—

ভাবছেন—তাই যদি জানি তো এত দিন কথাটা সরকারের কাছে প্রকাশ করিনি কেন, তাই না?

হাঁ—মানে—

প্রকাশ করিনি কারণ প্রকাশ করবার সময় হয়েছিল না বলে। কিন্তু এতকাল পরে আজ সে সময় এসেছে—আমি প্রকাশ করবো কথাটা।

কার—কার কাছে আছে হীরাটা? প্রশ্নটা করে কেমন যেন বোকার মতই তাকালেন সুন্দর সিং খাঁ সাহেবের মুখের দিকে।

যার কাছে আছে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে এইখানেই আপনার পরিচয় ঘটবে।

এইখানে।

হাঁ—এই জেলের মধ্যে—এই ঘরের মধ্যেই—

সে বুঝি আসবে এখানে!

বলতে পারেন তাই—

ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে—বুদ্ধির অগোচর মনে হয় মিঃ সিংয়ের।

আবার প্রশ্ন করেন, আচ্ছা খাঁ সাহেব—আপনি যে কথাটা জানেন—সে কি সে কথাটা জানে!

বোধহয় সে জানে।

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন দিলীর খাঁ সুন্দর সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।

হীরাটা তার কাছ থেকে আবার তাহলে আমরা ফিরে পাব না বলেই আপনার মনে হয় খাঁ সাহেব?

হাঁ পাবো—এবং আর মিনিট পনেরর মধ্যেই হয়ত পাবো।

বলেন কি?

তাই—

নিশ্চয়ই, হীরাটা তাকে দিতেই হবে।

কিন্তু সে তো না দেবার জন্য চেষ্টা করতে পারে?

ভয় নেই, তার ব্যবস্থাও আমি আগে থাকতেই করে রেখেছি, যাতে করে তার কোন আপত্তিই আমার কাছে টিকবে না। বলতে বলতে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দিলীর খাঁ সম্মুখে, সুন্দর সিংয়ের পায়ের জুতোর দিকে তাকাতে লাগলেন।

হাঁ, তারপর তুমি আবার দেখা দিলে মধুপালের গ্রেপ্তারের সময় শ্রীরামপুরে। হীরাটা তখন তোমার হাতে তবু তোমার নীচ মন শয়তানীতে মশগুল! তুমিই যে প্রীতম সিং সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই! ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ, আমি তোমাকে বলেছিলাম ১৫ মিনিটের মধ্যে হীরা চোরকে আমি ধরে দেব। ঠিক পনের মিনিটই হয়েছে ; দেখ হাত তোল এই দেখছো আমার হাতে কি, পালাবার চেষ্টা করেছো কি গুলি করে মারব! আর আমাকে ধাপ্পা দিতে পারবে না শয়তান! তোমার লুকোচুরি খেলা শেষ হয়েছে আজ।

গ্রেপ্তার করতে চাও আমাকে! বেশ! তা তোমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা কোথায়?

এখনও আমার হাতে এসে তোমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পৌঁছয়নি বটে, তবে এখুনি সেটা পাবো। এখানকার পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টকে সব কথা লিখে আজ সন্ধ্যায় একটা চিঠি দিয়েছি, তোমাকে এখানে আজ সন্ধ্যায় আসতে বলবার পূর্বেই!...

কি বলছো তুমি? চিৎকার করে বললেন সুন্দর সিং।

হাঁ ঠিকই বলছি!

সহসা অতর্কিতে সুন্দর সিং বাঘের মতই দিলীর খাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এবং প্রচণ্ড একটা মোচড় দিয়ে দিলীর খাঁ সতর্ক হবার পূর্বেই তার হাতের পিস্তলটা কেড়ে দূরে ফেলে দিলেন। এবং এক ধাক্কা দিয়ে দিলীর খাঁ ওরফে রুস্তম আলীকে চেয়ারের উপরে বসিয়ে দিলেন। উত্তেজনায় সুন্দর সিংয়ের সর্বাঙ্গ তখন থরথর করে কাঁপছে!

Fool! তুমি কি মনে করো তোমার বাক্যাড়ম্বরে আমি ভয় পেয়েছি। শয়তান, পাগল!

শয়তান আমি না তুমি?...প্রতারক আমি না তুমি, পাপী, দোষী, তুমি আমাকে বল, তুমি একজন গোয়েন্দা। দোষীকে, খুনীকে, অপরাধীকে ধরিয়ে দেওয়া যার কাজ। আমি তোমাকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করছি। আমি তোমাকে খুনীর সহকারী ও সাহায্যকারী বলে অভিযুক্ত করছি। তুমি আমাকে খুনের দায়ে একটু আগে অভিযুক্ত করছিলে ; এখন আমিই তোমাকে একই অপরাধে অভিযুক্ত করছি...

সুন্দর সিং এবার বলেন, তবে শোন মহাপুরুষ!...প্রথম থেকেই তোমার কাহিনী কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে তা আমি কতকটা আন্দাজ করেছিলাম। মনে করো, চিন্তা করো কয়েক বছর আগেকার একটা ঘটনা। কোন এক শীতের সন্ধ্যায় এক হতভাগ্য শিক্ষিত বেকার যুবক লাহোরের কোন এক জুয়েলারীর দোকানের সামনে সন্ধ্যাবেলা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তিন দিন হতভাগ্যের পেটে একটি দানা পর্যন্ত পড়োনি। ক্ষুধাপিপাসায় কাতর। তার মনের অবস্থা তখন এমন ছিল না যাতে করে সে ভাবতে পারে কোথায় তখন সে ঘুরছে। এমন সময় একজন ছদ্মবেশী গোয়েন্দার চোখে সে পড়ে। গোয়েন্দা তাকে এসে অনেক প্রশ্ন করে এবং সেখান হতে চলে যেতে বলে। দুর্ভাগ্যক্রমে সে রাত্রে ওই জুয়েলারীর দোকানে চুরি হয়। ফলে, গোয়েন্দার সমস্ত সন্দেহ গিয়ে সেই বেকার যুবকের উপরে পড়ে এবং যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় চুরির অপরাধে। যুবক তার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য আদালতে অনেক কথাই বলেছিল, কিন্তু তার কথা বিশ্বাস কেউ করলে না। একজন কপর্দকহীন বেকার যুবকের কথা কে বিশ্বাস করবে। ফলে তার ছয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলো। দারিদ্র্যই তার সর্বনাশের কারণ ছিলো। অথচ সেদিন সেই গোয়েন্দা ইচ্ছা করলেই তাকে ছেড়ে দিতে পারত।

জেলে গিয়ে প্রচণ্ড একটা অভিমানে তার সারা অন্তর গেল ভরে। সমস্ত দেশের উপরে সমস্ত জাতির উপরে ; সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুর উপরেই একটা প্রচণ্ড ঘৃণা তার উপস্থিত হলো। তারপর সে সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও যখন কারাদণ্ড ভোগ করে জেল থেকে বেরিয়ে এল, একটা প্রতিশোধের আগুন তার সারা অন্তর জুড়ে তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে, তারপর সত্যি সত্যিই সে হয়ে উঠলো একজন শয়তান খুনী!...

আর সেই নির্দোষী হতভাগ্যকে ধরিয়ে দিয়ে গোয়েন্দার হলো পদবৃদ্ধি! দেশের লোক দিলে তাকে বাহবা, সরকার দিলে খেতাব। তুমিই সে স্বনামধন্য গোয়েন্দা রুস্তম আলী, যে সেদিন সেই হতভাগ্যকে বিনা দোষে ধরিয়ে দিয়ে বাহবা নিয়েছিলে।...এতটুকু মমতা সেদিন তোমার হয়নি? তার কাতর অশ্রুজলে তোমার প্রাণ এতটুকুও গলেনি সেদিন! ভেবে দেখো! সেদিন একজন নিরপরাধ দরিদ্র যুবককে কেমন করে

শয়তানের হাতে তুলে দিয়েছিলে! তার বুকের শয়তানকে জাগিয়ে তুলেছিলে! কিন্তু সেদিন সে যে ঐভাবে ধ্বংসের পথে শয়তানের হাত ধরে এগিয়ে গেল তার জন্য দায়ী আজ কে? তুমি গোয়েন্দা রুস্তম আলী! তোমার দেশ, তোমার সমাজ, তোমার বিচার পদ্ধতি।

বাইশ

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সুন্দর সিংয়ের কণ্ঠস্বর।

আর দিলীর খাঁ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

আবার বলতে থাকে সুন্দর সিং—জান সেই হতভাগ্যের নাম? জান সেই হতভাগ্য বিড়ম্বিত প্রবঞ্চিত কে? প্রীতম সিং।...খুনী শয়তান তস্কর প্রীতম সিং। কিন্তু সেই হতভাগ্য প্রীতম সিংয়ের এক যমজ ভাই ছিল। কয়েক ঘণ্টার মাত্র ছোট বড় তারা। অবিকল একই রকম তারা দেখতে ছিল। সেই যমজ ভায়েরই একজন আমি। সুন্দর সিং বড় আর প্রীতম সিং ছোট। হতভাগ্য ভাই আমার নবাব আমীর খাঁর অভিশপ্ত হীরার পিছনে ছুটতে ছুটতে সত্যই খুন হয়েছিল, কাশীতে সে রাত্রে। কাশীর গঙ্গায় যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সে আমারই যমজ ভাই প্রীতম সিংয়েরই। অন্য কারও নয়। যে রাত্রে কাশীতে সে আনোয়ারের হাতে খুন হয়, তখন আমিও কাশীতেই, সেই দিনই সকালে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। আমি তাকে অনুরোধ করি হীরাটা যার তাকে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু সে বলে হীরাটা নাকি শেঠজীর কাছে আছে। শেঠজীর সঙ্গে কথা হয়েছে সেই দিন রাত্রে কাশী থেকে হীরাটা তার সঙ্গে লক্ষ্ণৌয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। হীরাটা তার হাতে পৌঁছবার আগে সে নৃশংসভাবে আনোয়ারের হাতে নিহত হলো! এদিকে প্রীতম সিং-এর মুখে ঐ কথা শুনে আমি নিজেই শেঠজীর কাছ থেকে পুলিসের ভয় দেখিয়ে হীরাটা বাগিয়ে আনতে শেঠজীর বাড়িতে যাই। কিন্তু গিয়ে দেখি শেঠজী তার আগেই খুন হয়েছেন। জ্ঞানহীনা যমুনাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে আমিই হীরাটা চুরি করি ডাক্তারের পরিচয়ে বাধ্য হয়ে।

তার আসল হীরার বদলে আমি কোন নকল হীরা রাখিনি। তার কারণ—চুরি করবার সময় দেখতে পাই, আসল হীরাটার পাশে ঠিক অবিকল তেমনি আর একটি হীরা আছে। আসল হীরাটা চিনতে কষ্ট হয়নি আমার। অন্ধকারে সেটা শার্দূলের চোখের মত ঝক্ ঝক্ করে

জ্বলছিল। নকল হীরাটার কোন দীপ্তিই ছিল না! আসল হীরাটা তুলে নিই! কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারেনি। এরপর পরদিন সংবাদ পেলাম প্রীতম সিং নিহত হয়েছে। তখন প্রতিজ্ঞা করি, যেমন করে হোক তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব এবং পরে প্রবল একটা কৌতূহলও মনে এসে দেখা দিল যার ফলে এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে। পুলিসের বড় কর্তারা সব আমার ব্যাপার পরশু শুনেছেন!...এতদিন হীরাটা আমার কাছেই ছিল, পরশু সেটা তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছি। লোক মারফৎ হীরাটা তার আসল মালিকের হাতে আজ পৌঁছেও গেছে। সে সংবাদ, তারযোগে আজ সন্ধ্যায় তোমার এখানে আসবার আগেই পাওয়া গেছে। যদিও আমি টের পেয়েছিলাম তোমার কাহিনী কোন দিক লক্ষ্য করে চলেছে, নিছক একটা কৌতূহলের বশেই সব শুনছিলাম, আর মনে মনে হাসছিলাম। ভেবেছিলাম যাবার আগে সব তোমাকে বলে যাবো!

বলে যাবো...বলে যাবো!..হাঃ হাঃ হাঃ, কী বলবে?...অ্যাঁ...হাঃ হাঃ হাঃ, কি বলবে? হোঃ হোঃ!

হঠাৎ যেন কতকটা পাগলের মতই মিঃ সুন্দর সিংকে বাধা দিয়ে রুস্তম আলী কথাগুলো বলতে বলতে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

সুন্দর সিং চমকে তাকালো রুস্তম আলীর মুখের দিকে তাকালেন।

এমন সময় লক্ষ্ণৌয়ের পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ও কমিশনার সাহেব ঘরে এসে ঢুকলেন।

রুস্তম আলী ওদের ঘরে প্রবেশ প্রবেশ করতে দেখে আবার হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন—Look they are coming! Look! Look! everything is funny. পেয়েছি! পেয়েছি Eureka. হীরাটা পেয়েছি স্যার!...প্রীতম সিং নেই...রুস্তম আলী আছে, সুন্দর সিং আছে!...হাঃ হাঃ হাঃ...

অসহ্য হাসির দমকে যেন রুস্তম আলী ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল!

সুপার, কমিশনার ও সুন্দর সিং পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন।

হঠাৎ সুপার এগিয়ে এসে রুস্তম আলীর সামনে দাঁড়ালেন—

রুস্তম!...রুস্তম...স্থির হও!...

রুস্তম আলী হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—ইউরেকা! ইউরেক্কা...পেয়েছি, স্যার পেয়েছি, হীরা পেয়েছি...কিন্তু প্রীতম সিং বেঁচে নেই...মরে গেছে! হাঃ হাঃ...!

ভোরের আলো একটু একটু করে রাত্রি শেষের বিলীয়মান অন্ধকারের বুকে ফুটি ফুটি করছে!

রুস্তম আলী কিন্তু তখনও হাসছে হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ!

তারপর...অনেক দিন গত হয়ে গেছে।

রুস্তম আলী এখন পাগলা গারদে।

বদ্ধ উন্মাদ!

এখনও মাঝে মাঝে হঠাৎ এক এক দিন সুন্দর সিংয়ের ঘুম ভেঙে যায়, রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে মনে হয় কে যেন এক পাগল কেবলই হাসছে, আর হাসছে, হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ।

চমকে তিনি শয্যার উপরে উঠে বসেন...মনে পড়ে আমীর খাঁর সেই অভিশপ্ত হীরার রক্তঝরা কাহিনী।

শিউরে ওঠেন তিনি।